বৈশাখ, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—ভাদ্র)

সম্পাদকের কৈফিয়ৎ।

—:*:—

গত বৎসর সবুজ পত্র আমি দস্তুরমত চালাতে পারি নি, এর জন্য ও পত্রের গ্রাহকসমাজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ছাপার ভুলকে আমি তেমন মারাত্মক দোষ বলে মনে করি নে,—কেননা পাঠকমণ্ডলী ও ভুল নিজগুণেই অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারেন।

কিন্তু সবুজ পত্র যে, শেষ ছমাস ঠিক মাসে মাসে বেরয় নি, এইটেই হয়েছে তার মহাত্রুটি। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় তারিখের শাসন না মানবার পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়েছেন,—কিন্তু সে সব যতই সুযুক্তি হোক না কেন, তদনুসারেই যে ফাল্গুনের পত্র চৈত্রে এবং চৈত্রের পত্র বৈশাখে বেরিয়েছে, এ কথা বল্‌লে ঠিক কথা বলা হবে না। রায় মহাশয়ের সুমুখে অনেক সময় পড়ে আছে, সুতরাং সে সময়ের তিনি ঢিলেঢালা ভাবে ব্যবহার করতে পারেন, এবং তাঁর পক্ষে তা করাই স্বাভাবিক, কেন না দিনগোনা যৌবনের ধর্ম্ম নয়। অপরপক্ষে এ পৃথিবীতে আমাদের কাজের সময় সংক্ষেপ হয়ে আস্‌ছে— সুতরাং আমাদের পক্ষে সময়ের একটা হিসেব করে চলা আবশ্যক, অর্থাৎ আমরা তারিখের শাসন মান্‌তে বাধ্য। আমরা যে এ ক্ষেত্রে সে শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, তার একমাত্র কারণ—সে নিয়ম রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর হয় নি।—

কলম চালানো আমার সখ, কাগজ চালানো আমার ব্যবসা নয়। এর প্রমাণ, ব্যবসায়ীর হাতে পড়্‌লে সবুজ পত্র হয় এতদিনে বন্ধ হয়ে যেত, নয়ত তার চেহারা বদলে যেত। অব্যবসায়ীর হাতে পড়েছে বলে; সবুজ পত্র আজও প্রকাশিত হচ্ছে, এবং সেই একই কারণে তা অকালে প্রচারিত হচ্ছে। এই কালবিলম্বের জন্য আমরা অবশ্য লজ্জিত আছি, তবে সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমাদের আছে যে, এ পত্রের গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকেরা আমাদের কাছ থেকে কোনও দস্তুরমাফিক জিনিস পাবার বিশেষ প্রত্যাশা রাখেন না।

গত বৎসরের শেষাশেষি সবুজ পত্রের যে কখন কখন পঁয়ত্রীশ দিনে মাস হয়েছে—তার আরও একটি কারণ আছে। সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বদনাম থাকা সত্ত্বেও তার একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে প্রথম দু বৎসর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল—কি ওজনে, কি পরিমাণে—এ পত্রের প্রধান সম্পদ।—সবুজ পত্র বাঙ্গলার পাঠকসমাজে যদি কোনরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদালাভ করে থাকে ত সে মুখ্যতঃ তাঁর লেখার গুণে। সুতরাং গতবৎসরের আরম্ভেই তিনি যখন সমুদ্রযাত্রা করলেন, তখন জলে পড়্‌লুম আমি!

রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে এ কাগজ চালাতে পারব, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি। সুতরাং মাসের পর মাস একখানি করে গোটা সবুজ পত্র আমার পক্ষে একহাতে গড়ে তোলা যে অসম্ভব,—এ জ্ঞান আমি কখনই হারাই নি। আর যদি আমি এ কাগজ চালাবার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে নিতে

উদ্যত হতুম, তাহলে সমালোচকেরা আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব কর্‌তেন না। এ ত গেল লেখার কথা। তারপর আসে পরের লেখার সম্পাদনের কথা; সে বিষয়েও আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, কেননা সবুজ পত্রের সম্পাদককে ও কাজের বালাই নিয়ে বড় একটা ভুগতে হয় নি। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পৃথিবীর কোন দেশের কোন সম্পাদকেরই নেই—দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের লেখার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার আমার চিরদিনই ছিল,—কিন্তু সে লেখক হিসেবে, সম্পাদক হিসেবে নয়। এই কারণে গত বৎসর আমি সবুজ পত্র বন্ধ করে দেবারই পক্ষপাতী ছিলুম। শেষটা কিন্তু যাঁর অভিপ্রায়মত সবুজ পত্র প্রকাশ করা হয়, তাঁরই ইচ্ছামত ও পত্র বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আমি প্রতিশ্রুত হই। আমি বেশ জানতুম যে, রবীন্দ্রনাথ যে দেশেই থাকুন, বাংলার মায়া তিনি কাটাতে পার্‌বেন না,—এবং সবুজ পত্র তাঁর প্রতিভার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হবে না। এ আশায় আমি নিরাশ হই নি। প্রথম ছ'মাস তিনি নিয়মিত সবুজ পত্রের খোরাক জুগিয়েছেন। তার পর থেকেই সবুজ পত্র, অসাময়িক পত্র হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় যে ও কাগজ আমরা টিঁকিয়ে রাখ্‌তে পেরেছি, এতেই আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি।—দু'দিন পরে হলেও সবুজ পত্র যে মাসের পর মাস সশরীরে দেখা দিয়েছে, সে সবুজ পত্রের নবীন লেখকদের গুণে। তাঁদের একান্ত সহানুভূতি ও আনুকুল্য ব্যতীত, আমার পক্ষে সবুজ পত্র চালানো অসম্ভব হত। যখন সবুজ পত্রের উপর চারিদিক থেকে আক্রমণ চলছিল, যখন

বান্ধবেরাও আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে ছিলেন, তখন যে যুবকের দল কায়মনোবাক্যে আমাদের সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি এই সুযোগে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সবুজ পত্রের প্রতি এঁদের প্রীতির মূল্য আমার কাছে যে এত বেশী, তার কারণ এ প্রীতির মূলে এক সাহিত্যের সম্বন্ধ ছাড়া অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। এ স্থলে এঁদের নাম উল্লেখ করা অনাবশ্যক, কেননা সবুজ পত্রের পাঠকমাত্রেরই নিকট এখন তাঁরা নামে পরিচিত। মনের ভাব স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করবার সংকল্প ও শক্তি এঁদের সকলেরই আছে, সুতরাং এঁদের হাতে যে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং আশা করি সাহিত্য-চর্চ্চার সখটা এঁরা কোন কালেই ত্যাগ করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ আবার স্বদেশে ফিরেছেন, সুতরাং সবুজ পত্রের সকাল-মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই; অতএব এ কথা আমি অনেকটা ভরসা করে বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে আমরা তারিখের শাসন মেনে চলতে না পারলেও, মাসের শাসন সম্ভবতঃ লঙ্ঘন করব না।

সাহিত্যের সার্থকতা।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় সাহিত্যের আসরে মুখ খুললেই ম্যালেরিয়ার কথা তোলেন,—অমনি নবীন সাহিত্যিকদের দলে হাসির গর্‌রা পড়ে যায়। এ হাসির কারণ কি,—তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ম্যালেরিয়া যে এদেশে আছে, এবং ও পাপ দূর না হলে দেশের যে মঙ্গল নেই—এ কথা এক পাগল ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আর নবীন সাহিত্যিকদের সকলেরই যে মাথা খারাপ, এ কথা বল্‌লে একটু বেশী বলা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, নবীনদেরও মস্তিষ্ক এবং হৃদয় ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, আর সে হৃদয়ের মাপ ও সে মস্তিষ্কের ওজনও গড়পড়তায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। এ সত্ত্বেও তাঁরা ম্যালেরিয়া দমনের প্রস্তাব শুনলে হাসেন কেন?—হাসেন এই কারণে যে, প্রস্তাবটা করা হয় সাহিত্যের আসরে। ম্যালেরিয়াকে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু ও-বস্তুকে কেঁদেও ভাসিয়ে দেওয়া যায় না! তাই সরকার মহাশয় যখন এই নিয়ে করুণরসের অবতারণা করেন, তখন সভাস্থলে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। কেননা সকলেই জানেন—অন্ততঃ সকলের জানা উচিত যে, ম্যালেরিয়া কাব্যের বিষয় নয়; যদিচ ও-বস্তুর সংস্পর্শে স্বেদ, কম্প, মূর্চ্ছা, রোমাঞ্চ শীৎকার প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের প্রধান লক্ষণগুলি সব মানুষের শরীরে দেখা দেয়! বাংলা দেশের ঘাড় থেকে ও ভূত নামানোও

সাহিত্যের কাজ নয়—কেনন। কোনও সাহিত্যিক এ ব্যাপারের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র জানেন না। ফরমায়েস পেলে অবশ্য অনেক সাহিত্যিক বীররসাত্মক মশকবধকাব্য, অথবা রৌদ্ররসাত্মক জ্বরান্তক নাটিকা রচনা করতে পারেন—কিন্তু তাতে করে ম্যালেরিয়ার একটি কীটাণুও মারা যাবে না, লাভের মধ্যে শুধু সাহিত্যরাজ্যে ম্যালেরিয়া ঢুকবে। সরকার মহাশয় যখন প্রবীণ সাহিত্যিক—তখন সাহিত্যের এ অক্ষমতার কথা যে তিনি জানেন না, তা হতেই পারে না। সুতরাং আসলে তাঁর প্রস্তাব এই যে, সকলে মিলে আগে দেশের এই দুরবস্থা দূর করো, পরে অবসরমত আরামে সকলে মিলে সাহিত্যচর্চ্চা করা যাবে। দিনে কর কাজকর্ম্ম, গান-বাজনা হবে এখন রাত্তিরে,—ইতিমধ্যে যদি না সকলে ঘুমিয়ে পড়ো! আগে কাজ, পরে সখ। সাহিত্যচর্চ্চা যে একটা অকাজ—অন্ততঃ বাজে কাজ—এ ধারণা লক্ষ লোকের আছে। সরকার মহাশয়ের অপরাধ—তিনি মুখ ফুটে কথাটা শুধু বলেছেন, এবং সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার দোহাই দিয়েছেন।

এর বদলে রাজনীতি কি সমাজনীতির দোহাই দিলে, বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরা তাঁর ভয়ে নিশ্চয়ই জড়সড় হয়ে যেতেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে সাহিত্যের সৃষ্টি যে একটা অনাসৃষ্টি মনে করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সচরাচর মানুষে, কথা ও কাজের ভিতর একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ দেখে, এবং সেই সঙ্গে মনে করে যে, এর একটা হচ্ছে আর একটার উল্টো;—আর তাও যদি না হয় তাহলেও কাজের ওজন যে কথার ওজনের চেয়ে ঢের বেশী, সে বিষয়ে ও-মহলে বড় কারও মতভেদ নেই, এবং ভবের হাটে ওজন অনুসারেই বস্তুর মূল্য নির্ণয় হয়। রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরার"

চাইতে একখানা রণতরীর মূল্য যে লক্ষগুণে বেশী, এ সত্য এত মোটা যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক তা না দেখে থাক্‌তে পারে না। এর প্রতিবাদ কর্‌তে হ'লে বল্‌তে হয় যে, প্রত্যক্ষ ও প্রমাণ এক জিনিস নয়; তাহলেই ওঠে ন্যায়ের তর্ক, আর সরল বুদ্ধির লোকের কাছে সে তর্ক হচ্ছে কূটবুদ্ধির বাগ্‌জাল, এবং সে জালে জড়িয়ে পড়তে অনেকেই নারাজ। অবশ্য সত্য কথা এই যে, কাজও এক রকমের কথা, আর কথাও বিশেষরকমের কাজ। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সম্ভবও নয়, দরকারও নেই। কথা মাত্রেই কাজ, আর কাজ মাত্রেই কথা হলেও, এর ভিতর অবশ্য ছোট বড়র প্রভেদ বিস্তর। মানুষের অনেক কথাই যে অকেজো, তা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মানুষের অনেক কাজই যে অকথ্য, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। সুতরাং বহুলোকে সাহিত্যিকদের হয় চুপ করে থাক্‌তে উপদেশ দেন, নয় কাজের কথা কইতে আদেশ করেন। ফুলের গাছকে ফুল ফোটানো বন্ধ করতে উপদেশ দেওয়া, কিম্বা তাকে ফল ফলাতে আদেশ করা অবশ্য সুবুদ্ধির কার্য্য নয়—কেননা সে উপদেশ, সে আদেশ পালন করতে সে বেচারা নৈসর্গিক কারণে অসমর্থ। এ বিশ্ব ভগবানের সৃষ্টি, সুতরাং এতে এমন সব বস্তু আছে আর হয়—যা দু-সন্ধ্যে গেরস্থালির কাজে লাগে না। এ সবের উপর এই কারণেই সাংসারিক লোকের একটা আক্রোশ আছে,—সুতরাং হয় তাদের বাতিল নয় বদল করবার জন্য তাঁরা সদাই উৎসুক। খোদার উপর খোদকারী করবার প্রবৃত্তিটে কাজের লোকের পক্ষে যেমন অদম্য, সৌভাগ্যবশতঃ তেমনি নিষ্ফল। এই সব কারণে সাংসারিক লোকেরা, মানব-সমাজে সাহিত্যের জন্মও বন্ধ করতে পারে নি, তার

শ্রীবৃদ্ধিরও হানি করতে পারে নি; যদিচ সাহিত্যিকদের উপর অত্যাচার করতে, অন্ততঃ তাদের লাঞ্ছনাগঞ্জনা দিতে জনসাধারণ কখনও কসুর করে নি। যদি কোথায়ও দেখ যে, কোনও সাহিত্যি-কের স্বসমাজে আদর হয়েছে—তখনই বুঝবে যে, সে ভদ্রলোক সাহিত্যের নামে বেনামি করে শুধু সাংসারিক কাজের কথা কয়েছেন।

(২)

আমি যে কাজের লোকের কথা বলছি, সে হচ্ছে কাজের কথার লোক। যারা যথার্থ কাজের লোক,—অর্থাৎ যারা লাঙ্গল চষে, ধান ভানে, চরকা কাটে, কাপড় বোনে, যারা হাত গুটিয়ে বসলে আমা-দের দু'দিনেই বাক্‌রোধ হয়ে যায়,—তারা অবশ্য সাহিত্যের উপর কোনই অত্যাচার করে না; বরং সাহিত্যই তাদের উপর চিরদিনই অত্যাচার করে আসছে। যারা পড়তে জানে না, লেখার উপর তাদের ভক্তি যেমন অযথা তেমনি অচলা। বারোমাস তারাই সরস্বতীর পূজা করে, যারা একদিনও দোয়াতকলম ছোঁয় না। যে কথা বইয়ে আছে, তাদের বিশ্বাস সে কথা মন্ত্র; এবং সে মন্ত্র যত বেশী দুর্বোধ তত বেশী তার মাহাত্ম্য। লোকশিক্ষার আসল দরকারটাই এই জন্যে যে, লেখাপড়া না শিখলে লোকের লেখাপড়ার ভয় ভাঙ্গে না। যে স্বল্পসংখ্যক লোক লেখাপড়ার সাহায্যে অসংখ্য নিরক্ষর লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এবং সেই দলিলে নিজেদের কাজের লোক মনে করেন,—সাহিত্য রচনা করা তাঁদের মতেই অকাজ। যারা নথি পড়ে কিম্বা পুঁথি পড়ায়, মন্ত্র

পড়ে ও মন্ত্র পড়ায়, খাতা লেখে কিম্বা পত্র লেখে,—তারাই সাহিত্যকে হয় অবজ্ঞা নয় উপেক্ষা করে। সামাজিক জীবনে এ সব লেখাপড়ার দরকার আছে, সুতরাং গুরুপুরোহিত, উকীল মোক্তার কেরাণী মাষ্টারের দল যে কাজের লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এবং সে কাজের মূল্য যাই হোক, তার বাজার দর আছে। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শুধু নিজের ভাবনা ভাবেন, আর দু'চার জন অবসর মত পরের ভাবনাও ভাবেন। প্রথম দলের মতে সাহিত্যচর্চ্চাটা বাজে কাজ, দ্বিতীয় দলের মতেই অকাজ। এই পরোপকারীর দল হয় রাষ্ট্রীয় নয় সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার করতে সদাই ব্যস্ত, এবং তাও একমাত্র লেখাপড়া অর্থাৎ কথার সাহায্যে। তাই মানুষের সকল কথাকে তাঁরা তাঁদের কাজে লাগাতে চান্, এবং যে কথায় হাল-ফিল সমাজের কি রাজ্যের বদল না হয়, তাঁদের বিশ্বাস সে কথার অপব্যয় হয়। যাঁর কথার ভিতর রূপ নেই কি শক্তি নেই, তিনি অবশ্য সাহিত্যিক নন্। অপরপক্ষে যাঁরা আগে নিজের উপকার করে, পরে পরের উপকার করতে ব্রতী হন, প্রায়শঃই দেখা যায় যে তাঁদের উপর লক্ষ্মীর যতটা কৃপা আছে, সরস্বতীর ততটা নেই। এঁরা সাহিত্যের উপর বিশেষ বিরক্ত, কেননা ভাল কথার এ ক্ষেত্রে বাজে খরচটা এঁদের কাছে একেবারেই অসহ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কথাও যা, এঁদের কথাও তাই—শুধু যে ম্যালেরিয়া তাড়া-বার প্রস্তাব এঁরা করেন, সে হচ্ছে এর ওর দেহের নয়—সমগ্র সমাজ-দেহের ম্যালেরিয়া। সে ম্যালেরিয়া যে এ দেশে আছে, আর যথেষ্ট পরিমাণে আছে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ স্থলেও সাহিত্যিকেরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য যে, এ রোগের চিকিৎসা

করাও সাহিত্যের কাজ নয়। সরস্বতী যে ধন্বন্তরী—এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না।

(৩)

এ কথা শুনে কাজের লোকেরা বল্‌বেন যে, তবে সাহিত্যের কি কাজ?—এক কথায় এর উত্তর দেওয়া শক্ত, কেননা সাহিত্যের কাজ প্রথমতঃ এক নয়—বহু; দ্বিতীয়তঃ একদিনের নয়—চিরদিনের। ভগবানের সৃষ্টির যেমন একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই, তেমনি মানুষের সৃষ্টিরও একটা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। নানা লোকে নানা যুগে তার ভিতর নানা অর্থ দেখ্‌তে পায়—এতেই ত সৃষ্টির বিশেষত্ব। সাহিত্যের বিশিষ্টতাও ঐ গুণে। সৃষ্টির জানাশোনা সকল অর্থই আংশিক হিসেবে সত্য এবং সমগ্র হিসেবে মিথ্যা, কেননা তার পূরো অর্থটা একটা রহস্য—ইংরাজিতে যাকে বলে mystery। যে উক্তির অন্তরে তার সকল ব্যক্ত স্পষ্টতার ভিতরেও একটা অব্যক্ত রহস্য ফুটে না ওঠে—তা সাহিত্য নয়। এবং মানুষের পক্ষে এই চির-রহস্যের দর্শন লাভটা নিতান্ত প্রয়োজন, নচেৎ সে নিজের হাতের মাপে অনন্তের ইয়ত্তা করবে, নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের হিসেব থেকে সৃষ্টির প্রয়োজন আবিষ্কার কর্‌বে—এক কথায়, তার ক্ষুদ্র অহংকে বিরাট আত্মার রাজাসনে বসাবে। সাহিত্যের প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে তার সাংসারিক প্রয়োজনের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়া,—আত্মাকে অহংএর হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। দেহের মত মনেরও একটা প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনসূত্রেই

সাহিত্য জন্মলাভ করেছে, এবং সেই প্রয়োজনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

এর উত্তরে অসাহিত্যিকরা বল্‌বেন,—এ সব দর্শনের কথা, অর্থাৎ গাঁজাখুরি। দর্শনের কথা যে শুধু বাজে কথা নয়, উপরন্তু মিছে কথা—এ কথা আমিও মানি। তার কারণ, প্রতি দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির একটি স্পষ্ট অর্থ বার করা, এবং তার ভিতর যে রহস্য আছে তা' নেই—এই প্রমাণ করা। সুতরাং যে মনোভাব থেকে দর্শন জন্মলাভ করে, সাহিত্য জন্মায় তার ঠিক উল্টো মনোভাব থেকে। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই বিশ্বের একদেশদর্শী, এবং সেই জন্য এ সব শাস্ত্রের ভিতর একটা একগুঁয়েমি আছে—যা কাজের বেলায় গোঁয়ারতুমিতে পরিণত নয়।—সমগ্র দৃষ্টি আছে শুধু সাহিত্যের; সুতরাং সাহিত্য, দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়, ধর্ম্ম-শাস্ত্রও নয়, নীতিশাস্ত্রও নয়—কিন্তু একাধারে ঐ সবই। মনোরাজ্যে এ প্রতিটিরই এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হয়ে ওঠবার দিকে ঝোঁক আছে,—সাহিত্য এ দুষ্কার্য্যে বাধা দেয়, অর্থাৎ এ সবের ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ করে তাদের নবাবীর দাবী অপ্রমাণ করে। তা ছাড়া, এই সকল একগুঁয়ে গোঁয়ার শাস্ত্র, সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, এবং এরা মনোজগতে যে কুরুক্ষেত্র বাধায়, সাহিত্য তার মধ্যস্থতা করে' সে জগতে শান্তি স্থাপন করে। তর্কের খাতিরে এ সব কথা মেনে নিলেও, পাঁচজনে বল্‌বেন,—সাহিত্য মানুষের মনের যে কাজেই লাগুক, মানুষের জীবনের কোনও কাজেত লাগে না; দর্শন বিজ্ঞান, ধর্ম্ম নীতি, এ সবারই একটা ব্যবহারিক দিক্ আছে। মানব সমাজ যে অসভ্য অবস্থা থেকে ক্রমে সভ্য অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, সে সবই ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে। কিন্তু

সাহিত্য জীবনের কোন কাজে লেগেছে? মানুষকে চলাবার কিম্বা কল চালাবার কোন উপায় সাহিত্য উদ্ভাবন করেছে? জীবন-ছাড়া মন পরলোকে থাক্‌তে পারে, ইহলোকে নেই। সুতরাং সাহিত্য যদি জীবনের সহায় না হয়, তাহলে তার পরলোকগামী হওয়াই উচিত। সংক্ষেপে সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সাহিত্য ম্যালেরিয়া দূর কর্‌তে পারে না। এ কথা ঠিক, ও হচ্ছে ফলিত-বিজ্ঞানের কাজ, ফলিত-সাহিত্যের নয়;—কেননা ফলিত সাহিত্য বলে কোনও বস্তু নেই। এ অভিযোগের উত্তর হচ্ছে যে, যে-মনে পৃথিবী হতে ম্যালেরিয়া দূর কর্‌বার প্রবৃত্তি জন্মায়, সে মন গড়ে সাহিত্যে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, দেশের দেহ থেকে ম্যালেরিয়ার বিষ নামানো কেন আমাদের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য? এ প্রশ্নের সর্ব্বজনীন উত্তর—এই কারণে যে, ও বিষ সাংঘাতিক, অর্থাৎ জীবনের পরিপন্থী; ম্যালেরিয়া হয় আমাদের মারে, নয় আমাদের সারে। অতএব ও-বস্তুকে দেশ-ছাড়া করা একটা মহৎ কাজ। মানুষের যত কাজ, সে সবেরই ত এক উদ্দেশ্য—মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু তারপর প্রশ্ন ওঠে, মানুষের বেঁচে থাক্‌বার প্রয়োজনটা কি?—এ প্রশ্নের উত্তর কাজ দিতে পারে না, কোন কর্ম্ম-শাস্ত্রও দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও নীতি-শাস্ত্র নিরুত্তর থাক্‌তে বাধ্য; বাচাল হয়ে উঠবে শুধু দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র। বেশীরভাগ ধর্ম্ম দর্শন এ প্রশ্নের উত্তরে বলবেন,—বেঁচে থাক্‌বার কোনই প্রয়োজন নেই; জীবনটাই হচ্ছে জগতের প্রধান উৎপাত। সহজ মানুষে দর্শনের উপর যে এতটা হতশ্রদ্ধ; তার কারণ ও শাস্ত্র মানুষকে মার্‌তে না পারুক, আধমরা করতে পারে; ও হচ্ছে মনোরাজ্যের ম্যালেরিয়া-বিশেষ। অপরপক্ষে ধর্ম্মের প্রতি যে মানুষের ভক্তি

আছে, তার কারণ ধর্ম্ম মানুষকে ইহলোকের ও-পারে আর এক লোকের সন্ধান বলে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া নেই। শুধু তাই নয়, ধর্ম্ম সে লোকে যাবার পথও আমাদের দেখিয়ে দেয়। তবে মানুষে যে ধর্ম্মকে ভক্তির চাইতে ভয় করে বেশী, তার কারণ,—ধর্ম্ম আর একটি লোকেরও খবর জানিয়ে দেয়, যেখানে ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নেই—এবং সেই সঙ্গে বলে দেয় যে, মানুষের পক্ষে সেই দ্বিতীয় লোকে যাওয়াটাই সহজ, এবং সেই কারণে বিশেষ সম্ভব!

সাহিত্যই জীবনের একমাত্র সহায়, কেননা একমাত্র সাহিত্যই মানুষকে বেঁচে থাক্‌তে শেখায়; জীবনধারণের কোনও অবান্তর ফলের লোভ দেখিয়ে নয়, মানুষকে নিত্য নবজীবনে জীবিত করে। সাহিত্য জীবনের অর্থ জীবনের মধ্যেই খোঁজে, তার উপরে নীচে কিম্বা আশে পাশে নয়; এবং এই কারণেই তার চির-রহস্যের সাক্ষাৎ পায়,—বৈদান্তিক যেমন আত্মার সাক্ষাৎ আত্মার মধ্যেই লাভ করেন। জীবনের আসল অর্থ যে জীবনের মাত্রা বাড়ানো, এ সত্য সরস্বতী হাতেকলমে প্রমাণ করে দেন। সাহিত্য আমাদের কোন বিষয়ে শিক্ষিত করে না;—কেননা তার একমাত্র কাজ হচ্ছে, মানুষকে জীবনে দীক্ষিত করা। সরস্বতীর স্পর্শে, যা মৃত তা জীবিত হয়ে উঠছে, যা সুপ্ত তা জাগ্রত হচ্ছে, যা অব্যক্ত তা ব্যক্ত হচ্ছে। এ সত্য প্রমাণ করা যায় না; কেননা এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ করবার বস্তু। মনোজগতেও অক্সিজেন আছে, যা না থাক্‌লে সে জগতে কিছুই বাঁচে না, কিছুই জ্বলে ওঠে না। যে কথার ভিতর সেই অক্সিজেন আছে, তারই নাম সাহিত্য—তা সে গানই হোক, গল্পই হোক, দর্শনই হোক, বিজ্ঞানই হোক, ধর্ম্মই হোক আর নীতিই হোক। এই কারণেই ইউরোপের প্রথম আর শেষ দার্শনিক

প্লেটো, এবং বার্গসনের দর্শন কাব্য ; এবং এই কারণেই সেক্সপিয়র ও কালিদাসের কাব্যও দর্শন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, যখন দেখা যাবে সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমাজের অভিযোগটা বেড়ে চলেছে, তখনই বুঝতে হবে নবসাহিত্য-সৃষ্টির যুগ এসেছে। জীবন পদার্থটা যখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই নে—তখনই আমরা তার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্ত হই। জীবনটা হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় সখ, এবং এই সখের চর্চ্চা করাতেই' সাহিত্যের সার্থকতা। এ অবস্থায় সাহিত্যকে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়বার অনুরোধ করার অর্থ, মশা মারতে এমন কামান পাতার উপদেশ দেওয়া, যার গ্যাসের স্পর্শে কিছুই মরে না, সবই বেঁচে ওঠে।

বীরবল।

লিখিবার ভাষা।

(বঙ্কিমচন্দ্রের মত)

বঙ্কিমচন্দ্র যে বহুবিধ প্রবন্ধ লিখেছেন, এ কথা আমার শোনা ছিল; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের একটি প্রবন্ধের সঙ্গেও আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। এ নিতান্তই আপশোষের কথা; কেননা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, যে-সব মতামত প্রচার করবার দরুণ সাহিত্য-সমাজের শুদ্ধাচারীরা আমাদের একঘরে করবার চেষ্টা করছেন, তার অনেক মতই বঙ্কিমচন্দ্রের মতের ঠিক অনুবাদ না হলেও, এক রকম নূতন সংস্করণ। এ কথা পূর্ব্বে জানা থাকলে, আমি বঙ্কিমচন্দ্রের আড়ালে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতুম, তাতে আর কিছু না হোক্, বিপক্ষদল আমার উপরে এলোমেলোভাবে বাণ বর্ষণ করতে সঙ্কুচিত হতেন। সে যাই হোক, বঙ্গসাহিত্যে আমরা যে পথ ধরে চলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রই সে পথের প্রদর্শক। সে পথে যে আমরা তাঁর চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, তার কারণ—সেটা যথার্থই একটা পথ, চোরাগলি নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ পড়্‌লে প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর মনের বেশী বদল হয় নি। আমাদের সমাজ নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, অতীত নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে যে তর্ক তাঁরা করতেন, আমরাও তাই করছি—এবং কতকটা একভাবেই করছি। একালের পূর্ব্বপক্ষ যে সেকালের পূর্ব্বপক্ষের উত্তরাধিকারী, তার

পরিচয় তাঁদের কথাতেই ধরা পড়ে, এবং উত্তরপক্ষের উত্তর সেকালে যা ছিল একালেও তাই আছে ; সে জবাব এই যে, যা চলে আস্‌ছে তা চলবে কিনা, সে হচ্ছে বিচারসাপেক্ষ।

(২)

একটা চল্‌তি উদাহরণ নেওয়া যাক্। সকলেই জানেন যে, সাহিত্যের মাঠেঘাটে যে তর্কটা আজকাল জোরের সঙ্গে চল্‌ছে, সে হচ্চে ভাষা নিয়ে। এ তর্ক বহুকাল পূর্ব্বে তুলেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র; আমরা সেই তর্কটাই আবার নতুন করে তুলেছি। এ কথা আগে জান্‌লে, আমি তাঁর সূত্র অবলম্বন করে তার ভাষ্য রচনা কর্‌তুম, এবং তাতে কেউ আপত্তি কর্‌তেন না ; যদিচ সকলেই জানেন যে, টীকাভাষ্যে মূল-সূত্রের মর্ম্ম বদ্‌লে যায়, ও তার ধর্ম্ম বেড়ে যায়। এ বদল হয় ভাষ্য-কারের দোষে নয়—কালের গুণে। আমরা সব বিষয়ে একটা authority চাই; ইতিপূর্ব্বে সেই authority দেখাতে না পারাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী আমার কথা শুনে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছেন, নচেৎ নাড়তেন উপরনীচে। আমি যে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতেরই জের টেনে এনেছি, সেইটি দেখিয়ে দিতে পার্‌লে আশা করি আমাদের মাতৃভাষা সাহিত্যিকদের হাতে আর অত লাঞ্ছিত হবে না।

আমি আরম্ভেই বলেছি যে, আমি চল্‌তি ভাষার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের চাইতে একটু বেশী অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু সে শুধু ক্রিয়াপদে—থিওরিতে তিনি চল্‌তি ভাষার দিকে আমাকে ঢের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে চল্‌তে হলে, বিষবৃক্ষ নয়, আলালের ঘরের

দুলালকেই আমাদের গদ্যের আদর্শ করতে হয়। কেন ?—তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(৩)

আমার নামে অভিযোগ এই যে, আমি সাধুভাষার উপর আক্রমণ করেছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি বঙ্গসাহিত্যকে নিজের জোরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছি। সাধুভাষার উপর যদি কেউ তীব্র আক্রমণ করে থাকেন ত সে বঙ্কিমচন্দ্র; এবং সে আক্রমণের বেগটা যে কত তীব্র, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকেই পাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঃ—

"কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা।.........সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গলা ক্রিয়াপদের আদিমরূপের সহিত সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার অধিকার তাহার ছিল না।"

"তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গলা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গলা লিখিতে পারেই না।.........সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বরবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল.........তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গলা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল"—

এর পর, বঙ্কিমচন্দ্র যে কোন্ ভাষার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে-ছিলেন, সে কথা বোধহয় আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই, কেননা তিনি এ স্থলে যথেষ্ট স্পষ্ট কথা বল্‌তে কসুর করেন নি। বাঙ্গলা-গদ্যের আদি লেখকদের কোনরূপ খাতির রাখাও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নি। তার কারণ তিনি চেয়েছিলেন ঐ সাধুভাষাকে মূলে হাবাং করতে। এবং সেই জন্যই তিনি ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের জয়গান করে' তাঁর প্রবন্ধ সুরু করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা এই ঃ—

"টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।..... ... যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

আমিও সাধুভাষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, কিন্তু অত কড়া কথায় ও চড়া গলায় নয়; তার কারণ, ইংরেজি শিক্ষার আদিম ঝাঁঝটা আমাদের যুগে অনেকটা মরে এসেছে। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে বিষবৃক্ষের মূলে টেকচাঁদ ঠাকুর কুঠারাঘাত করেছিলেন, সেই বৃক্ষের কলমের চারায় আমাদের সাহিত্যজগৎ ছেয়ে গিয়েছে, এবং তারই ফলের অন্তরে পাঠক-সমাজ কাব্যামৃতের রসাস্বাদ লাভ করেন।

(৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকে বল্‌তে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি ওকালতি করেন নি, জজিয়তি করেছেন, এবং এ মামলার তিনি যে রায় দিয়েছেন, তাকেই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে—কেননা সে হচ্ছে সাধুভাষার বিরুদ্ধে বিলেত-আপিলের রায়।

এমন কথা যে অনেকে বল্‌তে পারেন, শুধু তাই নয়—আমার বিশ্বাস কেউ কেউ ইতিমধ্যে তা বলেওছেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। তিনি এ ক্ষেত্রে প্রথমে উকীল হয়ে সওয়াল জবাব করেছেন, পরে জজ হয়ে রায় প্রকাশ করেছেন। তিনি সাধুভাষার বিপক্ষে পূরোদমে লড়েছেন, কিন্তু "অপর ভাষার" পুরোদাবীর ডিক্রী দেন নি। তার কারণ, যেখানে রেষারেষী সূত্রে উভয়পক্ষের দাবীই অসম্ভবরকম বেড়ে যায়, সেখানে বুদ্ধিমান উকীলের পক্ষে সে দাবীর কিছু বাদসাদ দিয়ে বাহাজ করাটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এস্থলে বিচারকের আসন গ্রহণ করেন নি—তিনি "অপর ভাষার" কোটই বজায় রেখেছেন, শুধু তার অতিরিক্ত দাবীটে ছেড়ে দিয়ে। সাধুভাষীদের কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাক্‌, তাঁদের কথা তিনি আমলেই আনেন নি। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় "আলালের ঘরের দুলালের" বিরুদ্ধে এই আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, ও পুস্তক পিতাপুত্রে একত্র বসে পাঠ করা যায় না; এ কথার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ—

"তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্ত্তণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না"—

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ভাষাই প্রমাণ, তিনি সেকালের সাধুভাষীদের কোনরূপ তোয়াক্কা রাখ্‌তেন না। "অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা" করতে আমরাও বারণ করি, কিন্তু তাই বলে

সাধুভাষাকে, "বিদ্যাসাগরী" এই অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে বিশিষ্ট করতে আমরা সঙ্কুচিত হই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা গদ্যের গড়ন দেন, এ সত্য আমি প্রবন্ধান্তরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখার একটি মহাগুণ ছিল। বাঙ্গলা তাঁদের হাতে অপ্রাকৃত হলেও, সংস্কৃত তাঁদের হাতে বিকৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়, সেটি একটু রাগের মাথায় লেখা; এবং বোধহয় তার কারণ এই যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় "মৃণালিনীকে" শুধু "আলালের ঘরের দুলাল" নয়, "হুতুমপেঁচার" সঙ্গেও এক পর্য্যায় ভুক্ত করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন "টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার (ন্যায়রত্ন মহাশয়ের) ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই"। এ অবশ্য ভাষায় যাকে বলে উল্টোচাপ;—পাল্টা জবাব হিসেবে এ কথা অসঙ্গত নয়। আজকের দিনে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, মৃণালিনীর ভাষার সঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষার বিশেষ প্রভেদ নেই; কিন্তু এ দুয়েরই টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।—বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের যতই গুণগান করুন না কেন, তাঁর কলমের মুখ থেকে যা বেরিয়েছে, তা আলালী ভাষা নয়—যদি কিছু হয়ত দুলালী ভাষা। তর্কান্ধ হলে সাধুভাষীরা যে প্রতিপক্ষের ভাষার স্বরূপটি দেখতে পান না, তার প্রমাণ এ যুগেও দুর্ল্লভ নয়। নিত্য দেখতে পাই, সাধুবাদীরা বীরবলী ভাষাকেও হুতোমী ভাষার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দেন।

(৫)

বঙ্কিমীযুগে এ মামলার বাদী ও প্রতিবাদীরা বেশ স্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।—শিক্ষায় দীক্ষায় এ দুই দলের পরস্পরের

সঙ্গে পরস্পরের কোনও মিল ছিল না। সেকালে এই ভাষার ঝগড়াটা ছিল টোলের সঙ্গে কলেজের ঝগড়া। এর পরিচয় বঙ্কিম-চন্দ্রের মুখেই পাওয়া যায়। তাঁর কথা এই :—

"এক্ষণে বাঙ্গলাভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য"।—

এস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য "সংস্কৃত ভাঙ্গা" অর্থেই "সংস্কৃতমূলক" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রতিবাদী দলের পরিচয়ও তাঁর কাছথেকেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন :—

"অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে, উহা আমরা কেন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা, তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।"

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সুশিক্ষিত বল্‌তে বুঝতেন ইংরাজিশিক্ষিত। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবেই বাঙ্গালী বাঙ্গলা ভাষার ভক্ত হন, এবং এ শিক্ষায় বঞ্চিত হলেই লোকে "অনুস্বরবাদী" হয়।

টেকচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই

বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন”—

বিপক্ষদলের সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

“সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি”.........ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরাজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে।.........পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত”—

এই পক্ষাপক্ষ সুনির্দ্দিষ্ট থাকার দরুণ, সে যুগের ভাষার মামলার ইষু ছিল সবে একটি, এবং সেটিও ছিল অতি স্পষ্ট। এ তর্কটা যে আজকাল গোলযোগে পরিণত হয়েছে তার কারণ, এ কালের সাধু-বাদীরা “সংস্কৃতে সুশিক্ষিত নন, কিন্তু” “ইংরাজি জানেন”। তার পর “পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে”—এমন কথা মুখে আনবার সাহস অনেকের নেই। কেননা ও কথা বল্‌তে গেলে রাশ রাশ ইংরেজী কোটেসনের মার সহ্য করবার জন্য বক্তাকে প্রস্তুত হতে হয়; সেই ভয়েই ত আমরা ছন্দ নিরুক্ত কল্প ব্যাকরণ ইতিহাস পুরাণের দোহাই দিই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙ্গালী, সাহিত্যে বুদ্ধির পরিচয় দিত, এ যুগে আমরা পরিচয় দিই বিদ্যের। বাঙ্গলা সাহিত্য যে বাঙ্গলা ভাষাতেই লেখা উচিত, এই সোজা কথাটাকে শক্ত করে তোলবার জন্য, আমরা অপরাবিদ্যার ভাণ্ডার খালি করেছি—এর পরে পরাবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত সম্ভবতঃ এ তর্কের আর শেষ মীমাংসা হবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বল্‌তে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র—বিদ্যার ও “কচকচি” ত্যাগ করে, সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই এ মামলার বিচার করেছিলেন।

(৬)

আমি পূর্ব্বে বলেছি সেকালে এ মামলার ইষুটা ছিল অতি স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, পণ্ডিতি মতে :—

"যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোনও অধিকার ছিল না।"—এবং কলেজি মতে :—

"রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থলেই অরূপান্তরিত সংস্কৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে"—

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা চেয়েছিলেন তদ্ভব ও দেশী শব্দকে বয়কট কর্তে, আর ইংরেজি-শিক্ষিতেরা চেয়েছিলেন তৎসম শব্দকে বয়কট কর্তে।

সেকালে তদ্ভব শব্দের বিরুদ্ধে ভট্টপল্লীতে যে ধর্ম্মঘট করা হয়েছিল, এ অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তারই এক জায়গায় আছে :—

"ঐরূপ (আলালী) ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা না দিলে ইত্যাদি"—

বলা বাহুল্য এ লেখায় তদ্ভব ও দেশী শব্দই প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে। শুধু তাই নয়, আমার বিশ্বাস একালের সাধু-সাহিত্যে "ফলার" চলে না, এ যুগে সাহিত্যিকরা পাঠকদের ফলাহারি করান? এমন কি আমারি কাণেও খাট্টা শব্দটি খোট্টাই লাগে। সুতরাং "ফোঁটাকাটার" দল যে বেজায় সানুনাসিক ছিলেন, এ অপবাদ সত্য নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে "হুতোমী" ভাষারও সাহিত্যে স্থান

আছে, অপরপক্ষে বঙ্কিমের মতেই সে ভাষা তিরস্কৃত। লোকের রুচি ভিন্ন, এবং সেকালের পণ্ডিত মহাশয়দের চাট্‌নিতে অরুচি ছিল না। তাঁরা যে রঙ্গরসের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন—তার প্রমাণ ও রসের আতিশয্য বশতঃ বাংলার আদি গদ্য-লেখক মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থ দুই বন্ধুতে একত্র বসে পাঠ করা যায় না।

(৭)

আসলে বাড়াবাড়িটে করেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত দলের সেই মুখপাত্রেরা—যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের রাজ্য থেকে তৎসম শব্দকে বহিষ্কৃত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এই টোল আর কলেজের ঝগড়াটা বঙ্গসাহিত্যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়া। ইংরেজি শিক্ষার বলে যাঁরা বাঙ্গলার নব-ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিলেন, ক্ষত্রিয়ের তেজ তাঁদের শরীরেই ছিল। তাঁরা যদি তাঁদের মতানুসারে নব-বঙ্গসাহিত্য গড়ে তুলতেন—তাহলে সে সাহিত্যে যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি হত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নবীন বয়েসের নবীন উৎসাহে একখানি কাব্য রচনা করেন, যার ভিতর যুক্তাক্ষরের নামগন্ধও ছিল না; সে কাব্যের নাম "গোচারণের মাঠ"। যদি গদ্যলেখকেরাও তাঁর দেখাদেখি সাহিত্য রচনা করতেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র যে গোচারণের মাঠ হয়ে উঠত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত, ষোল-আনা না হোক চৌদ্দ আনা অনুমোদন করতেন, সে কথা তিনি নিজ জবানি কবুল করে

গেছেন। "সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য" অর্থাৎ দেশী ও বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ঃ—

"এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহারা (সাধুভাষার দল) রচনা হইতে একবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা দেখি না।.........এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।"

কার মত?—সেই ঘোরতর মূর্খ ইংরাজের মত, যিনি আসরফি ফেলে গিনি রাখেন। উপমাটি অবশ্য উল্টো হয়েছে, কেননা গিনিই বাজারে চলে, আর আসরফি অপ্রচলিত;—তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একালে অবশ্য আমরা, চল্‌তি বাঙ্গলার পক্ষপাতীরা, সাধুভাষীদের প্রতি ওরূপ ভাষা ব্যবহার করি নে। আমরা হলে বলতুম এই পণ্ডিতেরা সেইমত পণ্ডিত।

সে যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্র যে এই দেশী বিদেশী শব্দের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে পাওয়া যায় ঃ—

"বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দের প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে"—

আমাদের মত অবশ্য এত উদার নয়—কেননা অপর ভাষা হতে যদৃচ্ছাক্রমে শব্দ চয়ন কর্‌লে রচনা খিচুড়ি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ স্বাধীনতা সকলকে দেওয়া যায় না, কেননা কার কতটুকু "বলিবার" আছে, তার খবর শুধু তাঁর অন্তর্য্যামীই জানেন। আমরা এই

পর্য্যন্ত বলি যে, যে-বিদেশী শব্দ বাঙ্গলা হয়ে গিয়েছে—তা বাঙ্গলা কথা হিসেবেই ব্যবহার্য্য। সে যাই হোক্, যখন দেখতে পাচ্ছি যে, এক আরণ্যক-ভাষার উপদ্রবেই বঙ্গসাহিত্য অস্থির—তখন এ ক্ষেত্রে বন্য-ভাষার আবাদ কর্‌তে সাহিত্যিকদের পরামর্শ দেবার মত সাহস আমাদের নেই।

(৮)

আসলে কিন্তু দেশী শব্দকে সাহিত্যের জাতে তোলবার জন্য ওকালতির বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না। কেননা দেশী শব্দ বাঙ্গলা-ভাষায় খুঁজে পাওয়াই ভার। যে সব শব্দ কাণে শুন্‌তে মনে হয় "সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য", তাদের কুলের খবর নিতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা আর্য্যবংশোদ্ভব,—এক কথায় তদ্ভব। বাঙ্গালীর বুকে দ্রবিড়মঙ্গলের রক্ত থাকতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে মোগলতামলের ভাষা নেই। যে সব শব্দের মূল সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃতের জমি খুঁড়ে পাওয়া যায় না, তারা ভুঁইফোঁড় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার মতে সেগুলিকে দেশী না বলে, বিদেশীর দলে ফেলে দেওয়াই নিরাপদ।

সে যুগে আসল ঝগড়াটা ছিল তৎসমের সঙ্গে তদ্ভবের। শিক্ষিত সম্প্রদায় সাহিত্য হতে তৎসম শব্দের উচ্ছেদের জন্য যে আড়েহাতে লেগেছিলেন, তার পরিচয় আলালী ও হুতোমী ভাষায় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এই :—

"যদিও আমরা বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহশব্দের ব্যবহার উচ্ছেদ করিতে হইবে, মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের

উচ্ছেদ করিতে হইবে, কিন্তু আমরা এমত বলি যে; অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গলা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গলা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়"—।

এর পর সাধুভাষার পক্ষে আর কোন কথা বলা চলে না। বঙ্কিম-চন্দ্র অবশ্য অকারণেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতে কি কারণে তৎসম শব্দ ব্যবহার্য্য—তারও সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

(৯)

সংস্কৃতের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে সায় দিয়েছিলেম, তার একমাত্র কারণ—তাঁর মতে সকল সংস্কৃত শব্দ সাধারণের বোধগম্য নয়। তিনি বলেছেন:—

"এমন কতকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিমরূপ সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিমরূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে"—

এ কথা এত জোর করে বল্‌বার কারণ, তাঁর মতে গ্রন্থের প্রয়োজন:—

"যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। যদি কোন লেখকের উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই।......আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।......... যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমন দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল

যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই-ভাষা শিখিয়াছে তাহারা ভিন্ন অপর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।”...... ..

বাঙ্গলা ছেড়ে সংস্কৃত ব্যবহার করলেও, রচনা মধুর না হোক, তা যে যথেষ্ট সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হতে পারে—উপরোক্ত বাক্যগুলিই তার প্রমাণ। এস্থলে সাধুভাষীদের প্রতি ‘পাষণ্ড’ ‘বঞ্চক’ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বোধ হয় “তোর শীল তোর নোড়া, ভাঙ্গি তোর দাঁতের গোড়া” এই বচন অনুসারেই করা হয়েছে।

(১০)

আমরা অবশ্য তৎসম শব্দের বিদ্বেষী নই; কেননা বঙ্গ-সরস্বতীর ভাণ্ডারে ও-জাতীয় বহুশব্দ আছে। তাদের সাহিত্য থেকে উচ্ছেদ করবার কোনই কারণ নেই, এবং তাদের স্বত্ব রক্ষা করবার জন্য কোন ওকালতিরও দরকার নেই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ তাঁর বিশ্বাস ছিল বাঙ্গালী মাত্রেই জানে।—কিন্তু একটা জিনিস তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে; সে হচ্ছে এই যে, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ভিতর যে শুধু রূপের প্রভেদ আছে তা নয়, অল্পবিস্তর অর্থেরও প্রভেদ আছে। অনেকে বলতে পারেন যে, সে প্রভেদ অনেকস্থলেই অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু অর্থের এই সকল সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির প্রতি অমনোযোগী হয়ে লিখতে বসলে সে লেখা সাহিত্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ ‘ঘর’ ও ‘গৃহ’ শব্দ দুটি নেওয়া যাক্।—সকলেই জানেন যে “ঘরের কথাকে” “গৃহের বাক্য” বল্‌লে রচনার মস্তক ভক্ষণ করা না হো’ক, মাথা খাওয়া হয়। তারপর

গৃহস্থ ও "গেরস্থ", এ দুই একই ব্যক্তি নয়; আর গিন্নী ও গৃহিণীর ভিতর প্রায় সেই প্রভেদ আছে, যে প্রভেদ বামূনী ও ব্রাহ্মণীর ভিতর আছে। তা ছাড়া বাঙ্গলা ভাষায় দু'কথার সমাস চলে; এবং সেই সূত্রে যেখানে তৎসম কথা চলে, সেখানে তদ্ভব কথা অচল। কেউ যদি "চন্দ্রগ্রহণ"-এর পরিবর্ত্তে বঙ্গসাহিত্যে "চাঁদ নেওয়া"র পক্ষপাতী হন্, তাহলে তাঁর ভাগ্যে জুটবে শুধু অর্দ্ধচন্দ্র। যিনি বামুন ভোজন করান, তাঁর বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করে না। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের যে ইচ্ছামত অদলবদল করা যায় না, তা শত শত উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়;—সুতরাং আমাদের ও দুই চাই।

শুধু মানের হিসাবে নয়, কাণের হিসাবেও বঙ্গসাহিত্যে তৎসম কথার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে, সেই ছন্দ রক্ষা করতে কোথায়ও বা 'নূতন' কোথাও বা 'নতুন' শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

তবে তদ্ভবের সঙ্গে কতখানি তৎসমের খাদ মেশাতে হবে—তার সন্ধান বলে দেবে লেখকের সুরুচি। ভাষা সম্বন্ধে যাঁর রুচি সু নয়, তিনি হাজার পণ্ডিত হলেও তাঁর লেখা সাহিত্য হবে না।—যাঁর হাতে তদ্ভব ও তৎসম শব্দের মিলন "সুবর্ণে সৌভাগ্য" হয়, সাহিত্য-জগতে তাঁর ভাগ্য যে প্রসন্ন নয়, এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে সুতরাং নিষ্প্রয়োজনে তৎসম শব্দের ব্যবহার যে দোষের, বঙ্কিম-চন্দ্রের এ মত মেনে নিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই, যদি আমরা সাহিত্যের সকলরকম প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখি। আর এক কথা, নিষ্প্রয়োজনে তদ্ভব শব্দের ব্যবহারও সমান দোষের।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কঠিন আঘাতেও সাধুভাষা যে সাহিত্যলীলা সম্বরণ

করেন নি, তার কারণ, তাঁর তর্কের এক জায়গায় ফাঁক ছিল। তিনি বলেছেন যে, ভাষাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কর্‌বার জন্য সংস্কৃত শব্দের আবশ্যক। এ হচ্ছে সদর ফটক বন্ধ করে খিড়কির দরজা খুলে রাখা। বাক্যের গড়নই যে তার প্রধান সৌন্দর্য্য, এ জ্ঞান সকলের নেই।— "শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোণা পরলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল"—এরূপ যাদের ধারণা, সে বংশ আজও আছে। ঐ ভারি সোণার লোভে ঐ খোলা খিড়কির দুয়োর দিয়ে অলঙ্কার লোভীরা রাতারাতি সংস্কৃতের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যা হাতে পড়েছে, তাই নিয়ে এসে সরস্বতীর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন, ফলে অলঙ্কার পরার গৌরবে সাধুভাষা বঞ্চিত হয় নি। তবে তাতে করে বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমান থাকলে বল্‌তে পার্‌তেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ত্তমান সাহিত্য।

—॥॰॥—

দেদার ভিস্তি নাকি গোয়ালা সেজে বাঙলা সাহিত্যের হাটে খাঁটী দুধ বলে হুবহু ঘোলাজল চালিয়ে দিচ্ছে,—এমনধারা গুজব বাজারে খুব জোর রটেছে! কতিপয় সাধু সাহিত্যিক ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমসাধ্য গবেষণার পরে, জল আর দুধের যে তত্ত্বগত তফাৎ, সেটা নিঃশেষে ও নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। আর তাঁদের এই উপপত্তির প্রথম অনুমান হিসেবে কিছুদিন থেকে তাঁরা এমন কথাও খুব জোর গলায় যখনতখন বলে' আসছেন যে, সাহিত্যের পসরায় অজানা-অচেনা যা'-কিছু দেখা যাবে—সবই হবে অখাদ্য; অথবা সাহিত্যের আসরে বাঁধিগৎ ছাড়া যা'-কিছু বাজবে—সবই হবে বেসুরো!

তাঁদের মতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুরাতনের 'পরে নূতন আলোক-পাতের চেষ্টা—অনধিকারচর্চ্চা; আর নূতনকে পুরাতনের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়াস—সন্দেহজনক! এই সব সন্দেহ আর অনধিকার-চর্চ্চার হাত থেকে আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে গিয়ে, সাহিত্যিকদের ভিতরে যেরকম মারামারির সূত্রপাত হয়েছে, তাতে করে' সাহিত্য-ক্ষেত্র ক্রমশঃ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে! আর ইতিমধ্যেই এর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ছোট বড় মাঝারি নানান্ রকমের চক্রব্যূহের পত্তন সুরু হয়েছে।—দেখে শুনে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা যুগান্ত বা যুগ-সন্ধি-কাল এসে পড়েছে!

পার্ব্বত্য-প্রদেশ ছেড়ে, নদী যখন সমতলের বুকে গড়িয়ে পড়ে, তখন তার উচ্ছসিত কলহাসি পরিণত হয় মৃদুগুঞ্জনে, আর উদ্দাম অগ্রগতি পরিবর্ত্তিত হয় বিসর্পিত লাস্যে। অর্দ্ধশতাব্দী আগে বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমাদের সামাজিক মনে যে আলোড়ন ও অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছিল,—তা' থেকেই বাঙ্গলা সাহিত্যের উদ্ভব। নবীন সাহিত্য তখন নববলে, দৃপ্তবেগে, সমাজের বুকে, ভেঙ্গে-চুরে গলিয়ে-গুলিয়ে, তাণ্ডবতালে নেচে গেয়ে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে' নিয়েছিল,—কারও মুখ চায় নি, কোনো রাশ মানে নি!

আর এখন কালক্রমে সে-স্পর্শ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমাদের সামাজিক মনের সে উত্তেজনা ও আবেগ অনেক কমে এসেছে ;—তারি ফলে সাহিত্যের গতিও মন্দা হয়ে আসছে। সাহিত্য এখন প্রতি পদক্ষেপে সমাজের চাল-বিচার করছে!—নিজের অধিকার অনধিকারের দর কষাকষি করছে!—এ সব সাহিত্যের জড়তার লক্ষণ। যে অবস্থায় সাহিত্য কেবল সমাজকে পাশ কাটিয়েই যেতে চায়, নিজের উদ্ধত অধিকারের প্রেরণায় দেশ-কালের অতীত হতে পারে না, সে অবস্থায় তার কাছ থেকে বেশী কিছু চাওয়া দুরাশা!—আমাদের সাহিত্যের এখন সেই অবস্থা।

বাঙ্গালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি কিনা, তা' বুঝতে হলে প্রত্নতত্ত্বের দলিল, আর পুরাবৃত্তের জবানবন্দির প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালী জাতি যে অত্যন্ত ক্ষুধিত, সে কথা জানতে সাক্ষীসাবুদ তলবের কোনই দরকার করে না, পেটে হাত দিলেই তা' মালুম হয়ে যায়!, আর সব ক্ষিদের মত আমাদের সাহিত্যের ক্ষিদেও যথেষ্ট প্রবল। আর এ বিষয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত তীব্র ;—তার কারণ ও রসের স্বাদ

আমরা ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। বর্ত্তমান সাহিত্য আমাদের নতুন করে' বিশেষ কিছুই দিতে পারছে না।—কাজেই তাকে নিয়ে আমাদের এমন টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি লেগে গেছে! ক্ষিদের সময় খেতে না পেলে ছেলে মায়ের আঁচল ধরে টান্‌বেই!—বরং এমন টানাটানির সময়ে, একই দিক ধরে আমরা সবাই একযোগে যে একদিক পানেই টান্‌ছিনে, বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য না হলেও এই-ই যথা লাভ—অন্ততঃ মন্দের ভালো। আর, তা ছাড়া, ভাল-মন্দ'র ডিক্রি-ডিস্‌মিস্ যতই সোজাসুজি আমরা দিয়ে বসি না, সবসময়ে তা বাহাল থাকে না!—আজ আমাদের চোখে যা নেহাৎ খারাপ, কালে তা' থেকেই প্রচুর ভালোর সূত্রপাত হতে পারে। রাতের শেষে, ঊষার আগে, আঁধারের ধোঁয়া বেশী করে' ঘনিয়ে আসে।—কিন্তু সে কতক্ষণ!

অনাবশ্যক উৎপাত মনে করে, আজকে যার উচ্ছেদ-সাধনে আমরা উদ্যোগী হয়েছি, হয়ত তার'পরে ভিত্তি করেই আমাদের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হয়ে গেছে!

গ্রীষ্মের বিকেলে কাল-বৈশাখী যখন আমাদের খেলাধুলো সব মাটি করে দিয়ে, ঘরের দাবায় নজরবন্দী করে রেখে, আমাদেরই চোখের সাম্‌নে গোয়াল-ঘরের চালা উড়িয়ে, সুপুরিগাছের মাথা ভেঙ্গে, নানারকম অনর্থপাত করতো, তখন মনে হতো,—বাঁশ-ঝাড়ের মাঝখানে মাথাউঁচু করে ঐ যে বড় তেঁতুল গাছটা রয়েছে ওরই এ সব কারসাজি! রাজ্যের যত ঝড়-দম্‌কা সব ওর কালো কালো ডালগুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকে; আর খেয়াল হ'লেই এইরকম সব হাঙ্গামা বাধায়।—এ বিষয়ে সন্দেহ আমাদের মোটেই ছিল না; কারণ প্রমাণ যা ছিল, তা' স্পষ্টরকমে প্রত্যক্ষ।—ঝড়ের যত আস্ফালন,

যত দাপট্, সব ওই তেঁতুলগাছের ডালপালার ইসারাতেই হতো, তা আমরা বেশ দেখ্‌তে পেতাম। তার যত ডাক-হাঁক সব ঐ বাঁশ-ঝাড়ের ভিতর থেকেই আস্‌তো—তাতেও কোন সন্দেহ ছিল না! তখন মনে হতো তেঁতুলের গাছের গোড়া কেটে, অন্ততঃ মাথা মুড়িয়ে দিলেই, অতঃপর আর ঝড়ের আশঙ্কা থাকবে না! এখন দেখে শুনে সে মত বদ্‌লাতে হয়েছে। এখন আমরা নিজেরাও বুঝি, ছেলেদেরও বুঝিয়ে থাকি যে, আবহাওয়ার যোগ-সাযোগেই ঝড় ঝাপটের উৎপত্তি হয়,—তেঁতুল গাছের মাথা মোড়ালে তার নিবৃত্তি বা উপশম কিছুই হয় না!

সব ঝড়ঝাপট্ সম্বন্ধেই ঐ এক কথা। ইদানীং আমাদের সাহিত্যে যে ঝড়-ঝাপ্‌টার আমদানী হয়েছে—তার মূলেও রয়েছে আমাদের দেশের আবহাওয়া। শিক্ষা দীক্ষার তারতম্যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তারাজ্যে কোথাও বা তাপ বেড়েছে, কোথাও বা চাপের মাত্রাধিক্য হয়েছে, তারি ফলে, আমাদের সাহিত্য-প্রকৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় এ ঝড় ওঠা স্বাভাবিক, তাই ধীরে ধীরে এটা ঘনিয়ে উঠ্‌ছে;—বিশেষ করে কারো ঘাড়ে এর দোষ চাপিয়ে তার সম্বন্ধে কোনো সরাসরি হুকুম—মাথা ধর্‌লে মাথা কাট্‌বার ব্যবস্থার মতই সমীচীন হবে!

সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে সাহিত্যসেবীদের সমাহার যতই অপরিহার্য্য হোক না—সাহিত্যসৃষ্টির কাজে দ্বন্দ্ব একরকম অনিবার্য্য। দেশের সবারি মন যে একই সময়ে একই সুরে বাঁধা থাকবে, এমন আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত। এই অভাবের 'পরেই ত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যার দৌড় আর বুদ্ধির ঝোঁক যদি সবারি সমান হতো;

সবাই যদি সব কথা একদিক দিয়ে আলোচনা করে একইরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতো ; কিছুই অজানা বা গোপন থাক্‌বার সম্ভাবনা যদি না থাক্‌তো—তা হ'লে আর প্রকাশের উত্তেজনা কারো ভিতরে আস্‌তো না ! অজ্ঞতার অন্ধকার, বা সন্দেহের গোধুলি না থাক্‌লে সাহিত্যের আলোক ফুট্‌তো না ।

সাহিত্যিক ব্যাপারে দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুধু অনিবার্য্য নয়—স্বাভাবিক এবং দরকারী।—বারুদ যদি খাঁটী হয়, তাহ'লে আশপাশের চাপে তার কার্য্যকারীতা বাড়ে বই কমে না। সাহিত্যিক বাদ-প্রতিবাদও যতই তীব্র আর একাগ্র হয়, মীমাংসাও ততই ঘনিয়ে আসে ! তবে, সাহিত্যিক দ্বন্দ্বে অসহিষ্ণু বা অধীর হয়ে পড়্‌লে—অর্থাৎ এক কথায় মাথা ঠিক না রাখ্‌লে, কোনো মীমাংসাতেই পৌঁছনো সম্ভবপর হয় না— এ কথা সব সময়ে মনে রাখা উচিত।

তর্কের সময় মাথা অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠ্‌লে, যা একটু-আধটু বস্তু ওখানে আছে তা বেবাক বাষ্পে পরিণত হয় ; আর তার বহির্ম্মুখীন চাপ ঠেলে কোনো যুক্তিই ভিতরে ঢুক্‌তে পায় না। ব্যাপারটাকে মাঝে মাঝে নিষ্ঠা বলে ভুল হলেও, প্রকৃতপক্ষে এ গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয় ! নিষ্ঠার সংযম গোঁড়ামিতে থাকে না, আর গোঁড়া-মির জ্বালা নিষ্ঠার রাজ্যে অচল। বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্যের অনেকটা শক্তিই ব্যয়িত হচ্ছে—এই গোঁড়ামির পোষণে এবং শাসনে।

সাহিত্যের গোঁড়ামি হচ্ছে—ভাবরাজ্যের দাসত্ব-প্রথা। সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই উচিত নিজেকে এবং অপরকে এর বন্ধন থেকে যথা-সম্ভব মুক্ত রাখা। বুদ্ধিকে মতের দুয়োরে বদ্ধ রাখা আর যার পক্ষেই শ্রেয়ঃ হোক না, সাহিত্যিকের পক্ষে তা' মরণাধিক ! দেশের মনকে

সজাগ এবং সচল রাখবার ভার স্বেচ্ছায় যাঁরা নিয়েছেন—তাঁরা নিজে-রাই যদি মতের নেশায় অতি সামান্য কারণেই দিশেহারা হয়ে পড়েন—তা'হলে আর আমাদের আশা কোথায় ?

আশা করি আমার কথায় এমন কেউ মনে কর্‌বেন না যে, আমি সাহিত্যিকদের জন্যে, মতামতের উপদ্রবের বাইরে, কোনো অনির্দ্দিষ্ট ধুম্রলোকের ব্যবস্থা কর্‌ছি। আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁদের বুদ্ধির অঙ্কুরগুলো সমস্তই যেন মত আঁক্‌ড়ে ধরেই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চেষ্ট না থাকে। একহাতে ঢাল, আরেক হাতে তলোয়ার সত্ত্বেও, সেপাইয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা মাঝে মাঝে সম্ভব হয়; কিন্তু সাহিত্য রথীর সব হাতিয়ারই যদি তাঁর অরক্ষনীয় মতের পাহারায় নিয়োজিত থাকে, তাহলে প্রস্তাবিত অমতের আলোচনা তাঁর পক্ষে স্বভাবতঃই অসহনীয় হয়ে ওঠে।—আমাদেরও হয়েছে তাই। মত আমাদের এম্নি করেই পেয়ে বসেছে যে, মনন বা মনোনয়নের শক্তি এবং স্বাধীনতা কিছুই আর আমাদের নেই। এমন অবস্থা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না !

গোঁড়ামির তাড়নায় আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, এই পৃথিবীটা আমাদের গতিশীল।—কিছুই এখানে সুস্থির অবস্থায় নেই—কালের আবর্ত্তনে সবই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। আর, এই অবিরাম পরিবর্ত্তন-পরম্পরা হ'তে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' মানব-সভ্যতার অব্যবহিত অতীত স্তরের ভিত্তির 'পরে নবতর এবং উন্নততর সোপানের প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান মানবের লক্ষ্য।

নূতনের সৃষ্টিকে আমরা আমাদের লক্ষ্য করে নিই নি, পুরাতনের মধ্যে বুদ্ধির গোঁজামিলন দিতেই আমরা এখন ব্যস্ত আছি !

বর্ত্তমানের জন্যে ভাব্‌বার এবং কর্‌বার সামর্থ্য বা আত্মনির্ভর কিছুই আমাদের নেই; অথচ অতীতের জন্যে মাথাব্যথা আমাদের অসীম। অতীতের নীচে মাথা গুঁজে, আমরা গায়ের জোরে তাকে উন্নতিশীল বর্ত্তমানের সাথে সমপর্য্যায়ে রাখ্‌বার বৃথা চেষ্টায় গলদ্ঘর্ম্ম হচ্ছি। ফলে, অতীতের উপযোগিতা একটুও বাড়্‌ছে না, কিন্তু তার চাপে আমাদের মাথাব্যথা ক্রমেই দুরারোগ্য হয়ে উঠ্‌ছে!

সামাজিক মনের এ ব্যাধি সাহিত্যের উন্নতির পরিপন্থী। সাহিত্য স্থষ্টির পক্ষে অতীত আমাদের সহায় না হয়ে অন্তরায় হয়েছে!—যা' আমাদের অতীতে নেই, তাকে আমরা করি অগ্রাহ্য; আর যার আলোচনা অতীতে হয়েছে, বর্ত্তমানে তা'তে হাত দেওয়া আমরা মনে করি ধৃষ্টতা! লোক-সাহিত্যের কোনো বিভাগেই যেন আমাদের নতুন করে শোন্‌বার বা বলবার কিছুই নেই। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রকার এবং সাহিত্যিক সম্প্রদায় আমাদের সব বিষয়েরই শেষ কথা, সব অভিযোগেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়ে গেছেন।—আমাদের কাজ হয়েছে শুধু মাঝে মাঝে তার ঝুল ঝেড়ে চূণ ফেরান। তাঁরা আমাদের জন্যে যে আদর্শ, যে লক্ষ্য বাৎলে দিয়েছেন তা' থেকে চুল-মাত্রও এদিক ওদিক যেতে যদি কেউ ইঙ্গিত করে—তা'হলে সাহিত্য-সমাজে তার আর জল চলে না—কল্কে পাওয়া ত' অনেক দূরের কথা!

এমন বজ্র-আঁটুনী মাথা পেতে নেওয়া জীবিত সাহিত্যের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। সাহিত্য-স্রোত সচল এবং সতেজ রাখ্‌তে হলে জলের জাত বাছ্-বিচার চলে না!—ভাগিরথী যদি কেবল সাম-গান-পূতা সরস্বতী আর শ্যাম-বেণু-অনুকারী যমুনাকে কোল দিয়ে, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী আদি করে সব অকুলীনদের প্রত্যাখ্যানে কর্‌তেন, তা হ'লে হয়ত

সগরবংশ উদ্ধারের ঢের আগেই বেহারের তাপদগ্ধ, পিপাসার্ত্ত কোনো জহ্নুমুনি-নম্বর-দুই-এর জঠরে আবার তাঁকে অন্তর্হিত হতে হতো !

আজকাল বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাব আর ভাষার চৌহদ্দি নির্দ্দেশ করতে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা প্রায়ই এর গোড়ার কথাটি ভুলে যান। অতীতে যাঁদের প্রতিভার স্পর্শে আমাদের সাহিত্য নবকলেবর এবং শক্তিলাভ করেছিল---তাঁরা যথার্থ মুক্তপ্রাণ ছিলেন ! 'জ্ঞানের রাজ্যে তাঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানে কোনো প্রাচীর, হিন্দু-অহিন্দুর মাঝখানে কোনো পরিখা রচনা করেন নি ! নিজ নিজ বুদ্ধির কষ্টি পাথরে পরখ করে যা'-কিছু মূল্যবান মনে করেছেন, তাই দিয়েই তাঁরা সমাজ এবং সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে সমাজকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে সাহিত্য গড়তে বসেন নি।— আর সংস্কৃতমাত্রকেই শাস্ত্র, এবং শাস্ত্রমাত্রকেই অভ্রান্ত বলে' স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা সাহিত্যের আসরে নামেন নি ! এই স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভর তাঁদের ছিল বলেই বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে তার আসনের আশা পোষণ করে !

অনেক সময়ে আমাদের তথাকথিত সাহিত্যিক রক্ষণশীলতার সাফাই হিসেবে আমরা অতীত সাহিত্যিকগণের কথার অবতারণা করে থাকি। অন্ধের মুখে হাতীর বর্ণনার মতন, এই সব প্রতিভার আলোচনা আমাদের হাতে যা-ইচ্ছে-তাই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ গোঁড়ামির মোহে আমরা আচ্ছন্ন ! হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণাগুণ নাকি ডাইল্যুসনের মাত্রাভেদে কম-বেশী হয়।—আমাদের মত হাতুড়ের হাতে পড়ে সাহিত্যিকদের গুণাগুণও স্থলভেদে সুবিধামাফিক কম-বেশী হয়েছে। কারণ দরকারমত আমরা সেগুলোকে আমাদের গোঁড়ামির

আরকে dilute করে নিতে ইতস্ততঃ কচ্ছিনে! এম্নি ধারা গো-বধের সময় খুড়ো কর্ত্তা করে আমরা নিজেরই মনের কথা পরের মুখে সাজিয়ে দিচ্ছি।

এতে করে সাহিত্যিক আলোচনা একটুও এগোচ্ছে না! অতীতের সাক্ষী যদি নিতান্তই আমাদের নিতে হয়—তবে তাকে সমগ্রভাবে দেখ্তে হবে। তার সাথে একপ্রাণ হয়ে তার কথা বুঝ্তে হবে। আগে-ভাগে নিজের রায় ঠিক করে ফেলে—পরিশেষে অতীতের সাক্ষী তলব করে— তা থেকে যতটুকু রায়ের অনুকূল তাই ছেঁটে কেটে নিলে—কোনোই ফল হবে না,—আমাদের সত্য-নিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হবে।

আর, তা ছাড়া, অতীতের ডিক্রি ডিস্‌মিসের পরে যে আর আপীল চল্‌বে না—এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। "অতীতের তাঁরা সব ছিলেন হাতী ঘোড়া, আর বর্ত্তমানের আমরা হচ্চি তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের প্রাণী" এ কথা যিনি বলেন, তাঁর সাথে এক পর্য্যায়ভুক্ত হতে, আমার বিশ্বাস, অনেকেরই আপত্তি হবে।

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

বৈশাখ, ১৩২৪।

জাপানের কথা।

—:*:—
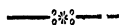
এসিয়ার মধ্যে জাপানই এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব করলে যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হয়ে উঠেচে, একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে পড়তেই হবে—এবং একবার পড়লে কোনকালে আর ওঠবার উপায় থাক্‌বেনা।

এই কথাটি যেম্‌নি তার মাথায় ঢুক্‌ল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন, যেন কোন্ আলাদ্দিনের প্রদীপের জাদুতে পশ্চিমলোক থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মত শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ করে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মত একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ করে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপন করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে—য়ুরোপের শিক্ষাকেও তারা তেমনি করেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে' পড়ল

না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধরতে লাগ্‌ল। প্রথম কিছু-দিন এরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া করে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই বসে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় করে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পূরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস ত যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি করে তোলা যেতে পারে! শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার করলেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত, তাহলে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মত মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন করে গড়ে তুল্লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিস তাকে গোড়া থেকে গড়তে হয় নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হল, অমনি তার প্রস্তুত হতে বিলম্ব হল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে পড়ে আয়ত্ত করে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা একান্ত ভেদ আছে, এমন কথা বল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে পড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে পড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম—লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু করে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চি, আমরা অভিমান করে বলি, "ওরা ভারি হাল্‌কা; আমাদের মত গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ করতে পারত না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গড়ে উঠ্‌তে পারে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে দিত পিষে।

মনের যে জঙ্গমত্বার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইকানকে বাঙ্গালী

কাপড় পরিয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী বলে সন্দেহ করবে না। এমন আরো অনেককে দেখেচি।

যে জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশী ঘটেচে, তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হয়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহলে বর্ব্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তারা পরকে ভয় করেচে, তারা অল্প-পরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচ্‌ল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে আলোড়িত করেচে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও দ্রাবিড়ে আর্য্যে যে মিশ্রন ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবি-মিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রন হয়েচে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি, এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয় নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে

গেচি—কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েচে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেচে। বিচিত্র উপকরণ ভালরকম করে গলে' মিলে বেশ নিবিড় হয়ে উঠেচে। চীন বা ভারতবর্ষের মত বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হয়ে উঠ্তে চেষ্টা করে, সংহত হতে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার করতে পেরেচে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চিরকালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য চীন কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ করতে পেরেচে; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবিত, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হতে পেরেচে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের

মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হয়ে উঠ্‌ল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্ত ভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার করে উড়ে চলেচে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেচে, এবং তাতে-করে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করচে; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারচে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হয়ে চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হয়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন ঘটে সুসঙ্গতি জেগে উঠচে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেচে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েচে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌চে। যে বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় করতে হয়—যে বিকৃতি প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে

জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেচে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মত তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েচে কিনা সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত এক-ঘরে হয়েছিল—তাতে করে' তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল। এই কারণেই বাঙালীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হয়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মত আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশী আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হত, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠচে—তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা-খোঁড়াখুড়ি করে মরচে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে

যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্যে বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠ্‌ল—সেটা হচ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠেচে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা কর্‌চি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মত পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেচে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড় বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চলবে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালীর উপরেই পড়েচে। এইজন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখতে পেয়েছিলেন, সে ত শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হচ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা এবং অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেচে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে

বসেচে। কিন্তু আমি যতটা দেখেচি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্মনৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চলতে থাকে, যে-সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম করে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করেচে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড় জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেচে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভাল করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কি। কিছু-দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেচে, সেই ধর্ম্ম হয়ত তাকে শক্তি দিয়েচে—অতএব খৃষ্টানীকে কামানবন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েচে যে,

খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাবদুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ বল্‌তে সুরু করেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা, ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেচে। এইজন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করচে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চল্‌তে পারত না; কিন্তু জাপানে চল্‌তে পারচে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ করচে—সে জান্‌চে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হচ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবলমাত্র সংস্কার মূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা বলে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মত এক-মহলা নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার করে আস্‌চে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশী হয়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বার কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্,

কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পারবে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড় জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশী মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতা-য়াতের একটা পথচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, এই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করবার কাজে বাঙ্গালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার কথা।

—:*:—

চৈত্রের সবুজপত্রে ভাষার সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ পড়িলাম। ভাষার কথা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই। এই সম্বন্ধে আমার মনে একটা সনাতন জড়তা আছে, এবং আমার বিশ্বাস খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমার মত দশাগ্রস্থ লোকের সংখ্যা কম নহে। এই বিষয়ে পরমহংস দেবের সুপরিচিত উক্তি মনে জাগিয়া আছে;—ভোজের সময় ততক্ষণই গোলমাল হয় যতক্ষণ পাত খালি থাকে,—পাত ভর্ত্তি হইবামাত্র বাজে কথা থামিয়া যায়। ভাষা লইয়া এত যে গোলমাল চেচামেচি চলিতেছে ইহা কাণে শুনিতে পাইতেছি বটে, কিন্তু মনে ঠিক যেন যাইয়া পৌঁছিতেছে না। মনে হইতেছে এ বেবাক বাজে বকা, কেহই ঠিক জিনিসটী খুঁজিয়া পাইতেছেন না, পথে দাঁড়াইয়া মেলা কোলাহল বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ঠিক জিনিসটী পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে। পুজনীয় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল,—এ কোলাহল নহে, ওকালতি নহে, দলাদলি মোটেই না, এ সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা; এ বিষয়ে প্রবন্ধ যত পড়িয়াছি, সবটাতেই ওকালতি দলাদলির গন্ধ পাইয়াছি। অবশ্য আমার নাসিকা যে সুস্থ, এমন স্পর্দ্ধা আমি কি করিয়া করি? তবে আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না,

এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে। তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য বলিয়া মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হইল, অভিসার মঙ্গলের দিকে—ইহা এই পক্ষের উকীল বা ঐ পক্ষের উকীলের লেখা নহে, দু'পক্ষেরই হিতৈষীর সসঙ্কোচ আবেদন। ঢাকা সাহিত্যসমাজের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেশ-চন্দ্র সেন "ভাষার আকার ও বিকার" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-ছিলেন, ঢাকা রিভিউতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাতে মাত্র একবার তুল্যরূপ সমদর্শিতার ও সত্যানুসন্ধানচেষ্টার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় বরিশাল হইতে যে "পূর্ব্ব-বঙ্গের উক্তি" পাঠাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহা পত্রিকায় স্থানদান করিয়া সবুজ পত্র সম্পাদক সুরুচির পরিচয় প্রদান করেন নাই।

ভাষার কথা আমি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চাই, এবং যথাশক্তি মন খোলসা রাখিয়া আলোচনা করিতে চাই। এই বিষয়ে বক্তব্য এতই অল্প যে, কয়েকটা সূত্রাকারে বোধহয় আসল কথা কয়টা বলা যায়।

১। একটা জাতির কথিত ভাষাই হউক আর লিখিত ভাষাই হউক, তাহা কাহারও কথায় বা লেখায় ধাঁ করিয়া বদলিয়া যায় না, তা সেই বক্তা বা লেখক যত শক্তিশালী বা দেশমান্য হউন না কেন।

শক্তিশালী লেখক ও বক্তাগণ পন্থা নির্দ্দেশ করেন, এবং নিজেরা সেই পথে চলিয়া সেই পথের সুগমতা, আপদহীনতা ইত্যাদির উদাহরণ দেখান। দেশের লোক বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘকাল পরে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে।

২। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যন্তস্থিত জেলার শিক্ষিত লোকেরও মুখের ভাষা বদলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং ধীরে ধীরে তাহা এক কথ্য ভাষা গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে, তাহা অপ্রতিরোধ্যরূপে লিখিত ভাষায় ঢুকিয়া তাহাকে ক্রমশঃই আদিযুগের সংস্কৃত-ভাঙ্গা বাঙ্গলা হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে।

৩। উপরোক্ত প্রথায় ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া যাইতেছে, এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া যে আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে, তাহার দিকে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের লিখিত ও কথিত ভাষা অগ্রসর হইতেছে। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন ইহাকে কোনও বিশেষ স্থানের ভাষা বলিয়া সনাক্ত করা কঠিন হইবে; তবে ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য। এই ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই।

৪। এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাত-সারে ইহা আপনা হইতেই গ্রহণ করিবে।

৫। তাহার পূর্ব্বে যদি কেহ বলেন যে, কথ্য ভাষায়ই লিখিতে হইবে, তবে সেই বাজে কথা কেহ শুনিবে না। আবার কেহ যদি বলেন যে, কেতাবী ভাষা ছাড়া লিখিলে পড়িব না, তবে তাহারই

ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাওয়া দরকার হইবে। এই বিষয়ে যেই পক্ষ যত জোরে কথা কহিবেন, সেই পক্ষেরই কথা তত ফাঁকা ও বেমানান হইবে। এমত অবস্থায় স্থীরধীর বক্তব্য এই যে, কথ্য ভাষায়ই লিখ আর সাধু ভাষায়ই লিখ, পড়িবার উপযুক্ত জিনিস থাকিলেই তাহা আদর করিয়া পড়িব আর পয়সা দিয়া কিনিব।

৬। শ্রীযুক্ত রবিবাবু সাধুভাষার দলের অসাধু ভাষা প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। কথ্য ভাষার দলের অকথ্য ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্তও 'বিরল নহে। এখন আমরা পাঠক সাধারণ, ইহাদের দুই দলই চুপ করিলে বাঁচি। কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। ভাষার রূপটা কথার জোরে ঠিক করিবার চেষ্টা না করিয়া, কাজের দ্বারা তাহা করিবার সময় আসিয়াছে। কালে কথ্য এবং লেখ্য ভাষা মিলিয়া যাইয়া সেই মিলিত ভাষা সাহিত্যে চলিবে, এবং কাজেই দুই দলেরই জয় হইবে। শান্তিপ্রিয়ের পরামর্শ এই যে, রাতারাতি জয়ের আশাটা পরিত্যাগ করিলেই অনর্থক বাকবিতণ্ডা কমিয়া যায় এবং দেশ জুড়ায়।

৭। পরিশেষে বানর গড়িবার কথাটা যে রবিবাবু তুলিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উল্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।
ঢাকা।

মন্তব্য।

—:o:—

ভট্টশালী মহাশয় এই প্রবন্ধের সংলগ্ন চিঠিতে লিখেছেন :—

"ভাষার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। সম্পাদককেও রেয়াৎ দেওয়া হয় নাই"।—

সম্পাদককে রেয়াৎ করা হয়নি বলেই এ প্রবন্ধটি "পত্রিকায় স্থানদান" করতে বাধ্য হলুম। নচেৎ লেখক এ লেখায় ভাষা ও ভাবের যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠকসমাজের কাছ-থেকে চেপে রাখতুম। ভট্টশালী মহাশয়ের বক্তব্য "স্থীরধীর" হতে পারে, কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গীটির ভিতর পরিচয় পাওয়া যায় শুধু অস্থিরতা ও অধীরতার। "বক্তব্য লিপিবদ্ধ" করবার যে তাঁর স্বর সয়নি, তার প্রমাণ তাঁর লিপিচাতুরি। লেখকবিশেষের হাতে সাধু-ভাষা যে কত সহজে অশুদ্ধভাষা হয়ে ওঠে,—এ প্রবন্ধটি তার একটি পয়লা নম্বরের নমুনা। বানান ও ব্যাকরণের উপর ভট্টশালী মহাশয় যে স্বেচ্ছামত অত্যাচার করেছেন,—তার পরিচয় পাঠক এ প্রবন্ধের অনেক স্থলে পাবেন, কেননা পাছে ভট্টশালী মহোদয়ের প্রবন্ধের শুচিতা নষ্ট হয়, সেই ভয়ে আমি তার উপর হস্তক্ষেপ করিনি। "কথ্যভাষায়" যাই হোক, "লেখ্যভাষায়" যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাকী পদগুলির অন্বয় হওয়া দরকার,—এ বিশ্বাস সম্ভবত ভট্টশালী মহাশয়ের নেই, নচেৎ নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির গড়ন অন্যরূপ হত।

"কিছু বলিবার ইচ্ছা বা প্রয়াস হয় নাই"।

"ঠিক জিনিসটি পাইবামাত্র সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া আনন্দধ্বনি উঠিবে।"—

"তাই মনে রাখিয়া এই জাতীয় প্রবন্ধ পড়িয়া কোনটাকে অবহেলার যোগ্য মনে হইয়াছে, কোনটা আবার শুধুই বিদ্রোহ ও ক্ষোভ জাগাইয়াছে, কিন্তু একটায়ও বিচলিত করিতে পারে নাই"।—

"চৌধুরী মহাশয় নিজের লেখা এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়দের লেখা উল্টাইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে পারেন যে কোনটা বেশী "কথ্য"।—

পাঠকমণ্ডলী ভট্টশালী মহাশয়ের লেখা না উল্টেও এমনি সোজা-সুজি ভাবে দেখ্‌লে দেখতে পাবেন যে, এ লেখা অতুলনীয়। ভট্টশালী মহাশয়ের স্বহস্তরচিত বাক্যগুলির অন্তর্ভূত অনেক পদই স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য। হইয়া করিয়া প্রভৃতি, ক্রিয়াপদের সাধুরূপ হতে পারে, কিন্তু তাদের উক্তরূপ ব্যবহার সাধুব্যবহার নয়। অসমাপিকা ক্রিয়াকে এ ভাবে সমাপন করায় শুধু ব্যাকরণ নয়, লজিকেরও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফরাসী দার্শনিক Bergson বলেন যে, মানুষ ছাড়া অপর জীবের মন থাকতে পারে, কিন্তু সে মনে subject, object এবং Predicate-এর সম্বন্ধজ্ঞান নেই; ও জ্ঞান যে কোন কোন মানুষেরও নেই, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধার করা যায়।

ভট্টশালী মহাশয় "কয়েকটা" "সূত্রাকারে" এই ভাষার তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছেন। কিন্তু "এই বিষয়ে" তাঁর "বক্তব্য এতই অল্প," যে এক্ষেত্রে অতগুলি "সূত্রাকারের" দরকার ছিলনা—

একটিতেই কাজ চলে যেত। তাঁর সপ্ত "সূত্রাকারের" "অদলবদল চুয়াইয়া যে সার বাহির হইতেছে" সে এই :—

"ধীরে ধীরে লিখিত ও কথিত ভাষার ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে এবং কালে উভয়ে মিলিত হইয়া আদর্শ ভাষার সৃষ্টি হইবে,.........এই ভাষা যখন গড়িয়া উঠিবে তখন কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। সকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ইহা আপনা হইতে গ্রহণ করিবে"।—

অর্থাৎ অবস্থার গুণে কালক্রমে যা আপনাহতেই হবে, তা হবে,—তার জন্য মানুষের কোনও ভাবনার আবশ্যক নেই। সাহিত্য জগতেও মানুষের মনের কোনও কাজ নেই, কেননা যা "নিজের অজ্ঞাতসারে" হয়, তাই গ্রাহ্য—জ্ঞাতসারে কিছু করবার চেষ্টা করাটাই অকর্ত্তব্য।—দেশসুদ্ধ লোককে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে পার্‌লে যে, তর্কবিতর্ক বিচার বিবেচনার কোনই বালাই থাকে না, তাতে আর সন্দেহ কি ?—এবং তাতে করে, যাঁদের "মনে একটা সনাতন জড়তা" আছে, তাঁরা নির্ব্বিবাদে সেই জড়তার সনাতনত্ব রক্ষা কর্‌তে পারেন।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষের মন জড়পদার্থ নয়, সুতরাং জড়বস্তুর মত তা নিষ্ক্রিয় থাক্‌তে পারে না ;—এবং মানুষ উদ্ভিদও নয়, যে সে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বলে, কালক্রমে "নিজের অজ্ঞাতসারে" ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ কর্‌বে। তবে মানুষ সচেতন পদার্থ হলেও, মানুষের মনে—ইংরাজীতে যাকে বলে inertia এবং সংস্কৃতে তমোগুণ—সেই জড়ধর্ম্ম আছে বলেই, সে মনকে ঈষৎ অগ্রসর কর্‌তে হলেও তার উপর তর্কবিতর্কের প্রবল ধাক্কা দেওয়া আবশ্যক।—এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সজ্ঞানে তা উপেক্ষা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই সহজ সত্যটি যে তাঁর

চোখে পড়ে নি, তার কারণ ভট্টশালী মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর মতে :—

"আপনার মতের উপর আপনার পুত্রের চেয়ে কম মায়া থাকে না, এবং এই দুর্ব্বলতা বিতর্ককালে তীক্ষ্ণধী ন্যায়পর ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত অল্পাধিক মেঘাবৃত করিয়া রাখে।"—

কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। যে মত মানুষে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গড়ে তোলে, সেই মতই যথার্থ তার "আপনার মত"। বিচারবুদ্ধি যে মতের সৃষ্টির কারণ, বিচারবুদ্ধিই তার স্থিতিরও কারণ। অপর পক্ষে, যে মত হচ্ছে আসলে পড়ে-পাওয়া,—যে মত মানুষে অজ্ঞাতসারে অতএব নির্ব্বিচারে আত্মসাৎ করে,—তার রক্ষার জন্য বিচারবুদ্ধিকে মেঘমুক্ত করবার কোনই প্রয়োজন নেই,—"সনাতন জড়তাই" যথেষ্ট।—তা ছাড়া মানুষের কাছে পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্যও একটু বেশী; এ ক্ষেত্রে চৌদ্দ আনা যে ষোল আনা হিসেবে গণ্য হয়, সে কথা ত লোকমুখেই শোনা যায়। এবং পড়ে-পাওয়া জিনিসের মূল্য বেশী বলে, মানুষের তার প্রতি মমতাও বেশী। এই কারণেই সে বস্তুর উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে লোকে—বিচার নয়, বিবাদ করতে প্রস্তুত হয়।

ভট্টশালী মহাশয় এ ক্ষেত্রে যে, বিচার নয় বিবাদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন—তার প্রমাণ, তিনি আমাদের সকল কথা মেনে নিয়েও তার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেছেন! সম্ভবত আমাদের মতটা মেনে নিতে বাধ্য হওয়াটাই তাঁর অক্রোশের কারণ হয়েছে। তিনি লিখেছেন :—

"ক্রিয়াপদের গঠনে রাজধানীর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকা অনিবার্য্য।"—

এর পর জিজ্ঞাসা করি, আমার সঙ্গে তাঁর মতের প্রভেদটা কোথায়? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বল্‌বেন যে, "যা অনিবার্য্য, তা নিবারণ করবার চেষ্টা করাটাই লেখকদের কর্ত্তব্য। কেননা লেখ্যর সঙ্গে একাকার কথ্য "ভাষা এখনও গড়িয়া উঠে নাই"। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে সে ভাষা গড়ে উঠলে, তা আদর্শ ভাষা হবে। তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লেখকেরা যদি কথ্য-ভাষাকে লেখায় স্থান না দেন, তাহলে কি উপায়ে ও দুই ভাষার একীকরণ সম্ভব হবে?—এ প্রশ্নের এক উত্তর আছে—আপনা-আপনি। "সনাতন জড়তা" থেকে কিছুই যে আপনা-আপনি জন্মে না, এ কথা বলা বাহুল্য।

ভট্টশালী মহাশয় বলেছেন যে, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্তের প্রবন্ধটিকে পত্রিকায় স্থান দান করে আমি সুরুচির পরিচয় দিই নি।—ও প্রবন্ধের ভিতর যে কি কুরুচি আছে, তা আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছি নে।—তবে ভট্টশালী মহাশয়ের সুরুচির জ্ঞান যে ঈষৎ অসাধারণ, তার পরিচয় তাঁর আগাগোড়া প্রবন্ধেই পাওয়া যায়।

পাঠকমাত্রেই দেখ্‌তে পাবেন, এ প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয় কি "ভট্টতা", কি শালীনতা,—এ দুই গুণের কোনটীরই পরিচয় দেন নি।

সম্পাদক।

———

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট্-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস।

—:০:—

বাঙ্গালী যে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহহীন, স্বদেশের প্রাচীন কাহিনীর জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ, কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সব কথা তুলিয়া আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিয়া এ বিষয়ে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন এখন কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার গ্রাম খুঁজিয়া, মাটী খুঁড়িয়া বাঙ্গালীই এখন তাম্রশাসন এবং শিলালিপি বাহির করিতেছে, বাঙ্গালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে, বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাহার ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল্য নির্ণয় করিতেছে। বাঙ্গালী ঐতিহাসিককে বাদ দিয়া এখন আর বাঙ্গলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের আকাশে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে আশা করা যায় ইতিহাসের মশাল তাহার একটা কোণ রক্তিম করিয়া রাখিবে।

আমাদের এই নবীন ইতিহাস চর্চ্চায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিতেছেন। তাঁরা বলেন তাঁরা যে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করিতেছেন তাহা পুরাণো ধরণের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা ইতিহাস নয়। তাঁদের রচিত ইতিহাস 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাস, এবং তাঁরা যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করেন তাহা 'বিজ্ঞানানুমোদিত-ঐতিহাসিক-প্রণালী'।

ইতিহাসের সম্বন্ধে এই 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'বিজ্ঞানুমোদিত' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির প্রকৃত অর্থটা কি তাহার আলোচনার সময়

হইয়াছে। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়ার, আর সকল রকম বিদ্যার আলোচনাকেই বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে, গত শতাব্দীর ইউরোপের ন-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সমাজে। ইউরোপ এখন আবার এই রোগটাকে দূর করিতে সচেষ্ট। সে দেশ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাধিটা যাহাতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া না চাপে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এ দেশে যা একবার আসে তাতো আর সহজে বিদায় হয় না; তা শক হূণই কি আর প্লেগ ম্যালেরিয়াই কি। বিশেষতঃ দুর্ব্বল শরীরে সকল রকম রোগই প্রবল হইয়া উঠে। আর দেহের রোগের চেয়ে মনের ব্যাধি যে বেশী মারাত্মক তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যে বিদ্যার চর্চ্চাই করি না কেন তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া প্রমাণ ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নিদান হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়-বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভূত উন্নতি, আর সেই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব্ব সাফল্য। প্রথমটীতে পণ্ডিতকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে দ্বিতীয়টী। রেল, জাহাজ, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বন্দুক, কামান ইহাই হইল জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকট মূর্ত্তি। এমন অবস্থা বেশ কল্পনা করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-গুলি ঠিক আজকার অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু সেগুলিকে ঘরগৃহস্থালীর কাজে লাগাইবার কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাপ ও বাষ্পের সকল ধর্ম্মই জানা আছে কিন্তু রেল ষ্টীমার তৈরী হয় নাই। তাড়িত ও চুম্বকের নিয়মগুলি অজ্ঞাত নাই কিন্তু ঘরে ঘরে বিনা তেলে আলো জ্বলে না, বিনা কুলীতে পাখা চলে না। ফ্যারাডে ও

ম্যাক্স্‌ওয়েল জন্মিয়াছেন কিন্তু এডিসনের জন্ম হয় নাই। যদি সত্যই এই ঘটনাটা ঘটিত, তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আজ যে আদর ও মর্য্যাদা আছে তাহার কিছুই থাকিত না। এবং কি ঐতিহাসিক কি অনৈতিহাসিক জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে কোনও পণ্ডিতই নিজের শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেন না। কারণ এই ব্যস্ততার মূলে আছে শাস্ত্রটাকে 'বিজ্ঞান' নাম দিয়া জনসমাজে জড়বিজ্ঞানের প্রাপ্য যে মর্য্যাদা তাহার কিছু অংশ আকর্ষণ করিবার লোভ। 'নামে যে কিছু যায় আসে না' এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে, এবং সেইখানেই ও তত্ত্ব শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের অর্দ্ধেক কাজ নামের জোরেই চলিয়া যাইতেছে, এবং পণ্ডিত-সমাজকেও সে সমাজ হইতে বাদ দিবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

নিজের শাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রালোচনার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া নিজের ও পরের মনকে বুঝাইবার যে ইচ্ছা তাহার আরও একটু গভীরতর কারণ আছে। যখনি কোনও একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে তখনি সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালী-টাকে সব তালার একমাত্র চাবী মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রেই সম্ভব অসম্ভব ফললাভের চেষ্টার পরিচয়, ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়াছে। দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই রাশি-ক্রমটার গুণ আর শক্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কারণ নাই। যে গণনা মেধাবী পণ্ডিতেরও

দুঃসাধ্য ছিল ইহার বলে শিক্ষার্থী শিশুও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে লাগিল। এমন ব্যাপারে লোকের মন স্বভাবতঃই উৎসাহে ও আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা। ফলে এই রাশিক্রমের নিয়ম ও প্রণালীকে সকল রকম বিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। এবং অবশেষে পিথাগোরাস্ ঠিক করিলেন যে জগৎটা রাশিরই খেলা, রাশিক্রমেরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং এই রাশিক্রমের হের-ফের আরও ভাল করিয়া করিতে পারিলে বিশ্বসংসারের কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিবে না। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বীজগণিতের প্রয়োগে জ্যামিতি-শাস্ত্রের হঠাৎ আশ্চর্য্যরকম উন্নতি হইল তখন পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে স্থির করিলেন যে জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী। অমন যে ধীর স্থির বৈদান্তিক স্পিনোজা তিনিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রটীকে জ্যামিতির খোলসে আবদ্ধ করিলেন। এখন সেই কঠিন খোলস অতিকষ্টে সরাইয়া তবে তাঁর চিন্তার রস গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর আসিল নিউটনের আবিষ্কৃত গণিতের পালা। নিউটন যখন তাঁর গণিতের সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহের সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন তখন চোখের সম্মুখ হইতে যেন চিরকালের অজ্ঞানের পর্দ্দাটা সরিয়া গেল। জাগতিক ব্যাপারের মূলসূত্রটা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এবং কোনও রকমে এই গণিতটা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যে সকল বিদ্যাই জ্যোতিষের মত ধ্রুব হইয়া উঠিবে সকলেরই এই স্থির বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসের জের এখনও চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও গত শতাব্দীর প্রথমে যখন তাড়িত ও চুম্বকের অনেক ঘরের কথা

বাহির হইয়া পড়িল তখন আবার জ্ঞানসমুদ্রে একটা ছোটখাট ঢেউ উঠিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মনের বল যে তাড়িতেরই শক্তি ইহা ত এক রকম স্বতঃসিদ্ধই বোঝা গেল, এবং স্ত্রী পুরুষ, জলস্থল, ঠাণ্ডাগরম ইত্যাদি যেখানেই জোড়া বর্ত্তমান সেইখানেই যে চুম্বকের দুই প্রান্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম বিদ্যমান, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কোনও সন্দেহ ছিল না। জর্ম্মাণ পণ্ডিত শেলিং এই চুম্বক বেচারীর উপর একটা ভারী রকমের গোটা দর্শনশাস্ত্রই চাপাইয়া দিলেন। বিজ্ঞ পাঠকের এ রকম ছোট বড় আরও অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে; এবং যদিও খুব ভয়ে ভয়েই বলিতেছি, আমাদের দেশে যে ত্রিগুণ তত্ত্বের চাবী দিয়া সংসারের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও আলোচ্য বিষয়ের আর একটা উদাহরণ।

সুতরাং আজ যে, সকল শাস্ত্রের আচার্য্যেরাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। এমন ঘটনা পূর্ব্বেও অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার ঘটিবে। বর্ত্তমান যুগের শরীর ও মন বিজ্ঞানের বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা একদিকে দেখিতেছি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির জ্ঞানের পথে অপূর্ব্ব সফলতা, অন্যদিকে দেখিতেছি কর্ম্মের জগতে তাদের বিস্ময়কর পরিণতি। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরের বিষয় লইয়া যাঁদের কারবার, তাঁরা যে একবার ঐ বিজ্ঞানের পথটা ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যখন দেখা যাইবে যে ও-পথটা যতই প্রশস্ত হোক্ ওটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই গন্তব্য পথ অন্য বিদ্যাগুলির

নয় তখনি মোড় ফিরিবার কথা মনে আসিবে। যাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে সে যদি হাটের পথের সোরগোল দেখিয়া সেই পথেই চলিতে সুরু করে তবে ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব ছাড়া আর কোনও ফল হয় না।

আমাদের নব্য-ইতিহাসের আচার্য্যেরা যে এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া, এই সব গভীর অগভীর কারণে চালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কেননা আমাদের দেশে এ কথাটা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মত একেবারে বিলাত হইতে তৈরী মালই আসিয়াছে; এবং ইংরাজী পুঁথির মাড়োয়ারী মহাজন ইহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস অনুসন্ধানের সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিকপ্রণালী কথাটার মূলে কোনও বস্তু আছে কিনা সে আলোচনা আমাদের দেশে নিস্প্রয়োজন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

(২)

অবান্তর কথা বাদ দিয়া মূল কথা বলিতে গেলে কেবল এই মাত্রই বলিতে হয় যে বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ, প্রকৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানের কাজের প্রণালী ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও ধর্ম্মের আবিষ্কার করা। কিন্তু এই কাজ কিছু বিজ্ঞানবিদ্যারই একচেটে নয়। পৃথিবীতে যেদিন হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে, মানুষ যখন বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় বাস করিত সে দিন হইতে কেবল মাত্র দেহ রক্ষার জন্যই মানুষকে অল্প বিস্তর এই কাজে হাত দিতে হইয়াছে। মানুষ যে দিন আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছে সে দিন সে প্রকৃতির এক মহাশক্তি আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়াছে।

যে দিন কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে সেদিন ত প্রকৃতির বহু বিভাগের কাজের প্রণালী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কথা এই যে, জীবন যাত্রাটা চালাইবার জন্য মানুষকে তাহার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির যে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়, বিজ্ঞানবিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহিত তাহার কোনও জাতিগত প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব তাহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়। সাধারণ ভাবে ঘরকন্নার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিরাট প্রকৃতির সমস্ত অংশের পরিচয় করা। সুদূর নক্ষত্রের গঠন উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবীক্ষণদৃশ্য কীটানুর জীবন ইতিহাস পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে; বিজ্ঞান বিদ্যার লক্ষ্য একবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলের দিকে। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসে ভূয়োদর্শনের ফলে এই যে জ্ঞান, ইহা সাধারণ জ্ঞান। নির্দ্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেমন করিয়া ঋতুপরিবর্ত্তন হয় সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, আর আহার অভাবে শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হয় এ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান। জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে এবং পরিপক্ক অন্নরস কেমন করিয়া জীব-শরীরের ক্ষয়পূরণ ও উপাদান গঠন করে সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। সাংসারিক কাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্থূল হইলেও চলে। তাহাতে চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজন নাই; বরং সে হিসাব করিতে গেলে সুবিধা না হইয়া অনেক সময়ে কাজ অচল হইয়া উঠিবারই কথা।

কিন্তু বিজ্ঞান চায় সকল জিনিসেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। একটা চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়ে ইহা সকলেই জানি, ইহা সাধারণ জ্ঞান। গাছটা প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে তাহা জানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রচলিত ঘড়ির সময়ের বিভাগ সাংসারিক কাজের জন্য যথেষ্ট; আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রকে কতকগুলি পরীক্ষার জন্য এক সেকেণ্ড সময়কে হাজার ভাগে ভাগ করা যায় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়ো-জনের পরিমাপ যন্ত্র মুদির দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞান বিদ্যার চাই 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'।

যেমন জ্ঞানে তেমনি জ্ঞানের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণে কোনও ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের চেষ্টায় আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি সেই ইন্দ্রিয় গুলিই বিজ্ঞানেরও ভরসা। যে ন্যায় ও যুক্তি আমরা প্রতিদিনকার সাংসারিক কাজে ব্যবহার করি সেই ন্যায় ও যুক্তির প্রণালীই বিজ্ঞানেরও একমাত্র সম্বল। এমন কি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আমরা জগৎ সংসারটার যেরূপ কল্পনা করি এবং যে রকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটী তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক জগৎ নির্ম্মাণের চেষ্টা করে। এ বিষয়টী ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁ এমন চমৎকার ভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহার পর আর কাহারও বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রণালী মূলে এক হইলেও বিজ্ঞান যে ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান চায় তাহার জন্য তাকে নানা রকম কৌশল আবিষ্কার করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এই গুলিই সেই কৌশল। ইহার কোনটীর লক্ষ্য

অতিদূর বা অতিসূক্ষ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনা, কোনটীর উদ্দেশ্য এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে তফাৎ করিয়া অন্য অবস্থায় তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা, কোনটীর চেষ্টা যে কাজের নিয়মটা, এমনি ভাল বোঝা যায় না তাকে গণিতের কলে ফেলিয়া আয়ত্ত করা। এই কৌশলগুলিতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশেষত্ব এবং ইহারাই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু এই বিশেষত্ব অতি বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব। অর্থাৎ যে কাজের জন্য যে কৌশলটীর দরকার সেই কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা বড় চলে না। কারণ এই কৌশলের আকার ও ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের বিষয় লক্ষ্যের দ্বারা। কাজেই এক বিজ্ঞানের কৌশলকে অন্য বিজ্ঞানে বড় কাজে লাগানো চলে না, এবং একই বিজ্ঞানের এক বিভাগে যে কৌশল চলে অন্য বিভাগে তাহা অনেক সময় অচল। গতি-বিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্বিজয়ী, রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না। রসায়ণের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী তাড়িত বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর যাহা বিশেষত্ব, তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাহিরে নেওয়া চলে না। এই বিশেষত্বের বেশীর ভাগই প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র, বিজ্ঞান বিশেষেই বিশেষ ভাবে আবদ্ধ। আর যাহা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই সাধারণ তাহা মোটেই বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ নয়। তাহা হইতেছে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের প্রণালী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানে ও সাধারণ জ্ঞানে কোনও ভেদ নাই। এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া কোনও লাভ নাই। কেননা এখানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই আসন এক জায়গায়।

সুতরাং ঐতিহাসিক যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা বলেন তখন প্রথমেই সন্দেহ হয় যে তাহার কথাটার অর্থ, যুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলিলে লোকের মনোযোগও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়টাকেও সে রকম মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময় কি যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।

দুই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' আমাদের দেশের নবীন ইতিহাসচর্চ্চার একটী প্রথম ও প্রধান ফল। সেই পুঁথি হইতেই দৃষ্টান্ত তুলিব।

দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে মহীপালদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে মহীপালদেব বাহুবলে সকল বিপক্ষ দল সংগ্রামে নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনেই তাঁহার পিতা বিগ্রহপাল দেবের বিষয় উল্লিখিত আছে যে তিনি সূর্য্য হইতে বিমলকলাময় চন্দ্রের মত উদিত হইয়া ভুবনের তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। এবং তাহার রণহস্তীগণ প্রচুরপয়ঃ পূর্ব্বদেশ হইতে মলয়োপত্যকার চন্দন বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া হিমালয়ের অধিত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে 'চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য 'কলাময়'ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা ও গজেন্দ্রগণ (আশ্রয় স্থানাভাবে) নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশিরসংযুক্ত হিমাচলের

অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।" এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাখাল বাবু টীকা করিয়াছেন, "মৈত্রের মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২১১ পৃঃ।) এ কোন বিজ্ঞান? মৈত্রের মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুযুক্তিসঙ্গত এবং রসজ্ঞতারও পরিচায়ক বটে এবং তিনিও সেই ভাবেই কথাটা লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বেচারাকে টানিয়া আনা কেন?

কহ্লন রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের গৌড়ের রাজাকে হত্যার এবং রাজ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য গৌড়পতির ভৃত্যগণের 'পরিহাস কেশব' নামক দেবতার মন্দির অবরোধ ও তাহাদের বীরত্বের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'গৌড় রাজ-মালায়' শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে এই কাহিনী সম্ভবতঃ অমূলক নয়, কেননা কহ্লন প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং মূলে সত্য না থাকিলে কাশ্মীরে গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনীর কোন জনশ্রুতি থাকিবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ, কহ্লন মিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্ব কাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি, অবলম্বনেই কহ্লন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কহ্লন কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয় কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ

করেন নাই। একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।" তারপর রাখাল বাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদ কর্ত্তা ষ্টাইন সাহেব এ ঘটনাটা "সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১০৭ পৃষ্ঠা) ষ্টাইন সাহেবের মত সত্য হইতে পারে এবং রমাপ্রসাদ বাবুর ভুল হইতে পার, কিন্তু কোন জনশ্রুতির মূলে সত্য আছে কিনা তাহা স্থির করিবার কোন বাঁধা "বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী" নাই। চারিদিক দেখিয়া এ কথাটা বিচার করিতে হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত হয় ত ইহা অল্প বিস্তর মতামতের বিষয়ই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব কিছু নাই। সচরাচর দশজনে একটা কথার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে যে রকম ভাবে বিচার করে এও ঠিক সেই রকমের বিচার। তারপর সম্ভবতঃ একটু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে, রাখাল বাবু তাঁহার "বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর" যে একটী সূত্রের কথা এখানে বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অচল। সে সূত্র আর কোনও বিচার না করিয়াই মানিয়া চলিতে হইলে, কি বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সমস্ত ইতিহাস রচনাই বন্ধ করিতে হয়। "বিজ্ঞানসম্মত" হইলেও প্রকৃত পক্ষে ও সূত্রটা কেহ মানিয়া চলে না, এবং প্রয়োজন হইলে রাখাল বাবুও মানেন না। তিব্বতের তারানাথ গোপালদেব গৌড়বাসীর রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রতিদিন একএকজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব

রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" এই রাজপত্নীর গল্প সম্বন্ধে রাখাল বাবু লিখিয়াছেন, "তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৫১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস' যে একই গ্রন্থের একই বিষয়ে এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে কেবল তাই নয়, একই দত্রের এক অংশকে উপকথা এবং অন্য অংশকে সত্য বলিয়াও সাব্যস্ত করে।

এইরূপে রাখাল বাবু তাহার সমস্ত গ্রন্থে বহুবার বহুস্থলে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথার অর্থ সাধারণ সুযুক্তিসঙ্গত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য, ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে, সেই রকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। যে প্রণালীতে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া মনে হয় বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছান যায়। এর চেয়ে ভুলধারণা আর নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা

রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের একদর হইত। কিন্তু প্রতিভাবান ছাড়া ত কেহ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ মজুরের দালান গাঁথা নয় যে ইটের উপর ইট বসাইয়া গেলেই হইল। যে উপাদান লইয়া সাধারণ লোকে কিছুই করিতে পারে না, ঐতিহাসিক প্রতিভা যাঁর আছে তিনি তাহা হইতেই সত্যের কল্পনা করিতে পারেন এবং অনুসন্ধানে সেই কল্পনা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। সব রকম বড় সত্যে পৌঁছিবারই এই পথ। তারপর এও ভুলিলে চলিবে না যে ঐতিহাসিকের, আসল কাজ ধ্বংশ করা নয় গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া, হাতে ধরা দিবে এমনও বোধ হয় না।

হয় ত উত্তরে শুনিব যে বিজ্ঞানের যেটা লীলাভূমি সেই সাগর পারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের নিয়ম কানুন কাটা ছাটা হইয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই আইন কানুন যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তাহা হইল সমুদ্রপারের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' খেলা। এ খেলার প্রবৃত্তি কেন হয় এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং লর্ড অ্যাক্টন বা সীলীর বচন তুলিয়া কোন লাভ নাই।

মানবজাতির মুক্তির জন্য ভগবান তথাগত যে চারটী মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটী এই যে সকল জিনিসই নিজের

লক্ষণে বিশিষ্ট; 'সর্ব্বং সলক্ষণং স্বলক্ষণং'। এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিস এক হয় না। বর্ত্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহিরে যে সকল বিদ্যা আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

ভাষার কথা।

—:*:—
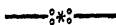
স্থিতি আর গতি—এ দুটী প্রকৃতির নিয়ম। একজন মনীষী লেখক হিন্দুধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—what it (Buddhism) destroyed no man has been able to restore and what it left no man has been able to destroy. এ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। What she destroys no man can restore and what she leaves no man can destroy, একটা জাতির মধ্যেও প্রকৃতির এই একই খেলা চল্‌ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির এই যে লীলা তা একটা জাতির মধ্যে যতটা পরিস্ফুট ততটা আর কোথাও নয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে আমরা চিরকাল প্রকৃতির এই খেলা সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাই, তার শিল্পের ভিতরে, কথার ভিতরে, সাহিত্যের ভিতরে। আর সাহিত্যর যে ভাষা সে সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

সাহিত্যের এই ভাষা নিয়ে বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে একটা আন্দোলন ও তর্কবিতর্ক চল্‌ছে। একদল কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করতে চাচ্ছেন, অন্যদল লেখ্য ভাষার অর্থাৎ যে ভাষাটা এতদিন চলে আস্‌ছে তারই সমর্থনকারী। এই দুই দল আপন আপন মত সমর্থন কর্‌তে গিয়ে যে সব যুক্তি উপস্থিত করেন তা

আমরা সব বুঝি বা নাই বুঝি, আমরা একথা বুঝি যে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘট্‌বেই। কারণ বাঙ্গালীজাতি বা বাংলা-ভাষা সৃষ্টিছাড়া একটা পদার্থ নয় আর পৃথিবীতে এ যাবৎ সকল ভাষা সম্বন্ধে যে নিয়ম খেটে এসেছে, বাংলা-ভাষা সম্বন্ধেও সে নিয়মের যে ব্যতিক্রম হবে না এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত। বেদের ভাষা ও কালিদাসের ভাষায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! চসারের ভাষা, সেক্ষপীয়রের ভাষা, ভিক্‌টোরিয়া যুগের ভাষা, প্রাচীন ও নব্য ফরাসী-ভাষা একটা ক্রম পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। বাংলায় রামমোহনের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এই পরিবর্ত্তনের নিয়মেরই সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এই পরিবর্ত্তন যে বঙ্কিম পর্য্যন্ত এসে থেমে যাবে, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ঊর্দ্ধগতিশীল বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যে, বঙ্কিমের ভাষাই যে শেষ কথা এ সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই সমীচিন নয়।

কিন্তু পরিবর্ত্তনের বিরোধী একদল চিরকালই আছে। মানুষের দুটী গুণ প্রকৃতিগত—একটী পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যটি নূতনের প্রতি টান। কিন্তু আমরা যে দলের কথা বল্‌ছি তাঁদের নূতনের প্রতি টান অপেক্ষা পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রাই অধিক। সুতরাং এঁরা পুরাতনকেই আঁক্‌ড়ে ধরে' থাক্‌তে চান। এমন কি বঙ্কিম যখন কটমট পণ্ডিতী বাংলার পরিবর্ত্তে দুর্গেশনন্দিনীতে অপেক্ষাকৃত কথ্য-ভাষার কাছাকাছি ভাষা চালালেন তখনও একদল ছিলেন যাঁরা বঙ্কিমের সে ভাষাকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে পারেন নি। কিন্তু আজ যখন সেই পণ্ডিতী বাংলা আর বঙ্কিমের বাংলা তুলনা করে' দেখি তখন তাঁদের, বঙ্কিমের ভাষার বিরুদ্ধে সেই আপত্তি দেখে আশ্চর্য্য বোধ করি। তাঁরা সহজটাকে যে কেন বক্র করে দেখেছিলেন তা আমরা

বুঝেই উঠতে পারি নে। অন্যপক্ষে আবার আর একদল আছেন যাঁদের পুরাতনের উপর শ্রদ্ধার চেয়ে নূতনের উপর টানের মাত্রাই বেশী। এই দুই দলই আপন আপন মত ও ইচ্ছাকে অত্যন্ত একান্ত ক'রে দেখেন। বলা বাহুল্য এই কারণে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত যে সত্য সে সত্যটা এই দুই দলের চিরকাল অগোচরেই থেকে যায়।

এইজন্যেই আমরা বর্ত্তমানের কথ্য-ভাষার ও লেখ্য-ভাষার কোন্‌টার গুণ কি কি, কোনটার দ্বারা কতখানি ভাবপ্রকাশের সুবিধে হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, ক্রমপরিবর্ত্তন যে ভাষার একটা স্বভাব সেই কথাটিই শুধু নির্দ্দেশ কর্‌ছি। ফলতঃ রামমোহনের সময় হ'তে একাল পর্য্যন্ত বাংলা-ভাষার যে আশ্চর্য্যরকম পরিবর্ত্তন হয়েছে তা যিনি বাংলা-সাহিত্যের কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন তিনিই জানেন। অতীতকালে বাংলা-ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে যাঁরা কোন আপত্তি করেন না, তাঁরা যে ভবিষ্যতে এই পরিবর্ত্তনের কেন বিরোধী তা বুঝে ওঠা কঠিন। আর যে কোন কারণ থাকুক না কেন, আমাদের মনে হয় এর অন্যতম কারণ হচ্ছে তাঁদের পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার, যে ভাষাটির সাথে তাঁদের এতদিনের পরিচয় সেটিকে ছেড়ে দিতে যেন তাঁরা কষ্ট ও অসচ্ছন্দতা বোধ করেন।

কিন্তু এখন যাঁরা কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার বিরোধী তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাক্‌তে পারেন, যাঁরা বলবেন যে ভাষার পরিবর্ত্তন যদি হয় তবে হোক্‌, কিন্তু কথ্য-ভাষাকে—বিশেষতঃ কোন প্রদেশ বা জেলাবিশেষের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা কর্‌বার চেষ্টাটা বাড়াবাড়ি। এঁদের অনেকেই একটা বিশেষ আপত্তি নির্দ্দেশ করেন যে যদি কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যে চালান যায় তবে ত

ঢাকার অধিবাসীও আপনার ভাষায় পুস্তক লিখ্‌তে বসে যাবেন। এই রকমে যদি প্রত্যেক জেলার লোক তার আপন আপন জেলার ভাষায় সাহিত্য রচনা কর্‌তে আরম্ভ করে তবে বাংলা-সাহিত্যের আদ্যশ্রাদ্ধ তো হবেই, বাংলাদেশ বলেও কিছু থাক্‌বে না। এই আপত্তিটী আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সমীচিন বলেই মনে হয় কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করে চিন্তা করে দেখ্‌লে এ ভয় অত্যন্ত অমূলক বলেই সাব্যস্ত হবে।

কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা কর্‌লে যে ঢাকার অধিবাসী কিম্বা অন্য কোন জেলার অধিবাসী আপন আপন জেলার ভাষায় বই লিখ্‌তে সুরু কর্‌বেন না, তার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, কলিকাতার ভাষায় ইতিমধ্যেই পুস্তক রচিত হয়েছে আর মাসিকপত্রে প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঢাকার ভাষায় কোন বই বা রচনা প্রকাশিত হয় নি (রজনী সেনের কয়েকটী ব্যঙ্গ কবিতা ছাড়া)। সে ভাষায় কেউ কিছু রচনা কর্‌বার চেষ্টায় আছেন এমন কথাও শোনা যায় না। আসল কথা এই যে বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর মনের কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার দিকে একটা স্বাভাবিক গতি আছে। এই বাংলাদেশের যে কোন জেলার লোকই হন না কেন শিক্ষিত হ'লেই তিনি নিজের জেলার আন্‌কোরা ভাষা পরিত্যাগ করেন। আর কিছু দিন কলিকাতায় থাক্‌লে তো কথাই নেই। তখন তিনি কলিকাতার ভাষাকেই আপনার ভাষা করে নেন। কলিকাতার ভাষার প্রতি শিক্ষিত মণ্ডলীর এই যে স্বাভাবিক টান তার কারণ যাই হক না, তা সত্য। এই কারণেই ঢাকা বা চট্টগ্রামের ভাষায় লেখা কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে স্থান পায় নাই। আর এই কারণেই নানান্ জেলার নানান্

ভাষায় পুস্তক রচিত হয়ে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে একটা অরাজকতার সৃষ্টি হ'বে সে আশঙ্কা একেবারেই অমূলক।

তা সত্ত্বেও কেউ যদি ঢাকার ভাষাতে বই লিখ্‌তে আরম্ভ করেন, এমন কি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ও সৃষ্টি করেন, তবে তাহা সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পঠিত হবে সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও সে ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। ফরাসী কবি মিস্ত্রাল (Mistral) তাঁর প্রাদেশিক ভাষায় প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য মিস্ত্রালের সে কবিতা ফ্রান্সে সর্ব্বত্র পঠিত ও সমাদৃত কিন্তু তাই বলে সে ভাষা ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে নি। বার্ণস্‌ (Burns) স্কচ্‌ ইংলিশে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন কিন্তু সে ভাষা ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা হয়ে পড়ে নি। কারণ লেখকের যে রকম অমানুষী প্রতিভাই থাকুক না কেন, ভাষারও একটা প্রকৃতি-পরিচালিত স্বকীয় প্রাণ স্বকীয় গতি আছে। আর সাহিত্যের ভাষার যা পরিবর্ত্তন তা ভাষার সেই প্রকৃতি পরিচালিত গতির মধ্য দিয়েই ঘটে, তার বাইরে দিয়ে নয়।

সুতরাং যিনি যে ভাষাতেই সাহিত্যে চালাতে চেষ্টা করুন না কেন তাঁর সে চেষ্টার সফলতা নির্ভর করবে এই জিনিসটির উপর যে সে ভাষা, আমরা ভাষার প্রকৃতি পরিচালিত যে গতি যে পথের কথা বলেছি সেই গতি সেই পথের অনুসরণ করছে কি না? তা যদি না হয়, যদি সে ভাষা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে তবে সে ভাষা সাহিত্যে কিছুতেই টিঁকে থাক্‌তে পারবে না। বঙ্কিম যদি কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ কমলাকান্ত রামমোহনের ভাষায় লিখতেন তার সাহিত্যিক মূল্য যাই হ'ক না কেন সে ভাষা পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌ত কি না সে বিষয়ে

ঘোর সন্দেহ আছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বিতীয় সামগ্রী। কিন্তু মেঘনাদবধের ভাষা বঙ্গ-কাব্যকুঞ্জে আর কারও কণ্ঠে ফুটলো না। তারও ঐ একই কারণ। সুতরাং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্য-ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে কি না, তা নির্ভর করছে কথ্য-ভাষা আর প্রকৃতির টানের যোগাযোগের উপর সে ভাষাটি প্রকৃতি-পরিচালিত গতির অনুকূল কি না তার উপর। কতদূর অনুকূল অথবা কতদূর প্রতিকূল সে বিচার আমরা এখানে করবো না। Fact হিসেবে ত দেখছি বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের উপর তার প্রভাব অনেক খানি। এই নবাগত ভাষা বাংলা-সাহিত্যে যাতে পাকা হ'য়ে বসতে পারে, ভবিষ্যৎ বাংলা-সাহিত্যেরই ভাষা হ'য়ে উঠতে পারে সে জন্য দরকার সেই অমানুষী প্রতিভা অলৌকিক মনীষা, যা সৃষ্টির দ্বারা দেখিয়ে দেবে যে এই ভাষা ভুঁইফোড়ও নয়, বিদ্রোহীও নয়, বাংলা-সাহিত্যের প্রাণের সাথেই এর অব্যর্থ সংযোগ, এ ভাষা বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের ভাষারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ভাষা হচ্ছে মন্ত্র। শব্দের মধ্যে ঋষি যেমন তাঁর তপস্যা-শক্তিকে চালিয়ে দিয়ে তাকে মন্ত্রে পরিণত করেন তেমনি লেখক তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে ভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ভাষা যেন সুপ্তবীণা। বীণার সপ্ত-তন্ত্রীতে সুর রয়েছে, তা যে কোন অঙ্গুলিস্পর্শে নিক্বণিত হয়ে উঠে। কিন্তু এই সপ্তভন্ত্রীর সপ্তসুরের পশ্চাতে একটী সমগ্র জগৎ বিদ্যমান—মানুষের যে রাগ দ্বেষ হাসি অশ্রু লজ্জা ঘৃণা ভয় মান এই সপ্তসুরের অন্তরালে লুক্কায়িত তা ফুটিয়ে তুলতে চাই বীণা সাধকের প্রতিভাময় অঙ্গুলির স্পর্শ। আমাদের কথ্য-ভাষা প্রতি-দিনের ভাষা। এর যে কি গুণ আছে না আছে তা আমরা ত কিছুই

জানি নে। এ ভাষাকে জ্বলন্ত করতে জীবন্ত করতে চাই প্রতিভার তপস্যা। প্রতিভাবান লেখক নবীন ভাষার শক্তি সৌন্দর্য্য ছন্দ তাল এক কথায় এর latent potentiality ফুটিয়ে তুল্‌বেন। এ ভাষায় প্রতিভাবান লেখক বা লেখকেরা এমন সাহিত্যের স্থষ্টি কর্‌বেন যার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত দেশের উপর ছড়িয়ে পড়্‌বে, তখন কি পাঠক কি লেখক সকলে সে ভাষার প্রতি দুর্ব্বার ভাবে আকৃষ্ট হতে থাক্‌বেন। তাই যখন হবে তখন নূতনের সৌন্দর্য্যে নূতনের তেজে নূতনের শক্তিতে পুরাতনের বিসর্জ্জনের আয়োজন চল্‌তে থাক্‌বে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য।

—০:※:০—
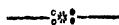
উপরোক্ত প্রবন্ধের মূল কথাটি আমি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করি, এবং মুখের ভাষার যে কালক্রমে পরিবর্তন হয়, আমার বিশ্বাস এ সত্য অন্তত মুখে কেউ অস্বীকার করেন না। এ সত্ত্বেও যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তার কারণ মুখের ভাষার পরিবর্তনের অনুযায়ী লেখার ভাষাকেও যে পরিবর্তিত করে' নেওয়া কর্তব্য এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত তর্ক ওঠে।

প্রথমতঃ—গতি জিনিসটে দুমুখো। পরিবর্তন উন্নতির দিকেও হতে পারে, অবনতির দিকেও হতে পারে। পরিবর্তন শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র, মানুষের চোখের সুমুখে হ্রাসবৃদ্ধির চেহারা এসে উপস্থিত হয়, এবং কাজেই লোকে না ভেবেচিন্তে হ্রস্বতাকে অবনতির ও বৃদ্ধত্বকে উন্নতির লক্ষণ বলে' মনে করে। যেহেতু তদ্ভব শব্দ প্রায়ই তৎ-সমের চাইতে আকারে ছোট সে কারণ, অনেকের বিশ্বাস বাংলা সংস্কৃ-তের অপভ্রংশ, এবং যদি তাই হয়, তাহলে অবশ্য ভাঙ্গাচোরা বাদ দিয়ে আস্ত জিনিসটেই সাহিত্যের কারবারে লাগানো সুবুদ্ধির কাজ। এ ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবার জন্য আমাদের বল্‌তে হয়, যে হ্রাসবৃদ্ধি বল্‌তে আমরা বুঝি পরিমাণের তারতম্য, ও হচ্ছে গণিতবিদ্যার হিসেব আয়ুর্বেদের নয়। নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, যে সব জীবের বিরাট কঙ্কাল আমরা যাদুঘরে দেখতে পাই তারা মানুষের চাইতে উন্নত-

স্তরের জীব ছিল। দেহের পরিমাণ থেকে, আত্মার পরিমাণ নির্ণয় করা দূরে থাক, দেহীর জীবণীশক্তি'ও যে নির্ণয় করা যায় না, এ জ্ঞান যদি সর্ব্বসাধারণ হত, তাহলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নবীনমত মানুষে দর্শন বলে গ্রাহ্য করত না। দেহাত্মবাদ আজও মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব করছে সুতরাং তার বিরুদ্ধে সকল ক্ষেত্রে লড়া দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মুখের ভাষার উপর আমাদের হাত নেই, সে ভাষার ক্রমপরিবর্ত্তন আমরা বন্ধ করতে পারি নে। লক্ষমুখে যে ভাষা গড়ে ওঠে—তার পরিণতি প্রকৃতি-পরিচালিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লেখার ভাষাকে এই পরিবর্ত্তনের হাত থেকে কতকটা বাঁচানো আমাদের করায়ত্ত। তা ছাড়া লেখার ভিতর ভাষাটাকে বেঁধে রাখবার প্রবৃত্তিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মুখের ভাষা বদলায় মানুষের অজ্ঞাতসারে এবং অজানা জিনিস নিয়ে মানুষে কারবার করতে সহজেই ভয় পায়। সুতরাং লেখায়, সাহিত্যের পূর্ব্বপরিচিত ভাষা ব্যবহার করা, লোকের বিশ্বাস লেখকের পক্ষে নিরাপদ ও সাহিত্যের পক্ষেও শ্রেয়ঃ। মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার একটা যথার্থ প্রভেদও আছে, সে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মুখের ভাষা organic এবং লেখার ভাষা organised অর্থাৎ শেষোক্ত ভাষাকে নিজের মনোমত করে গড়ে পিটে নেবার স্বাধীনতা লেখকের অনেক পরিমাণে আছে। Organised জিনিসকে স্থায়ী করা সহজ কেননা ওরূপ বস্তু আপনা হতেই জড়ত্ব লাভ করে, আর সকলেই জানেন যে জড়বস্তু পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন নয়। সাহিত্যের ভাষার এই একভাবে টিকে থাকবার স্বভাবটা অনেকে তার প্রধান গুণ মনে করেন, কিন্তু আমার মতে ঐটেই তার প্রধান দোষ। ভাষা যাতে

সাহিত্যে জমে' না যায়, সে বিষয়ে আমাদের সদাসর্ব্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। লেখার ভাষার গতি স্বভাবতই মৃত্যুর দিকে। মুখের ভাষার সংস্রবেই তাকে জিইয়ে রাখা যায়।' জীবন্ত ভাষাও লেখকদের হাতে পড়ে' যে কত শীগ্‌গির মৃত ভাষা হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ ভারতবর্ষের একাধিক কেতাবি প্রাকৃত। সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌লে লেখা জিনিসটেও Mechanical হয়ে পড়ে। এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই যা Mechanical তার বিরুদ্ধে লড়া দরকার। মানুষের দেহ মনের সকল কাজ যে কত সহজে Mechanical হয়ে পড়ে, এ জ্ঞান যাঁর আছে তিনি এই লড়ালড়িটে বৃথা কাজ বলে মনে কর্‌বেন না।

আমরা লেখায় সকলকে মুখের ভাষার অনুসরণ কর্‌তে বলি, অনুকরণ কর্‌তে নয়,—তার কারণ লেখার ভাষা মুখের ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। মুখের ভাষা, যে লেখায় দ্বিজত্ব লাভ না করে, তা সাহিত্য নয়, এবং বলা বাহুল্য লেখা মাত্রেই সাহিত্য নয়। অধিকারীর হাতে ভাষা পুনর্জ্জন্ম লাভ করে আর অনধিকারীর হাতে মৃত্যু। সুতরাং যাতে আমাদের কলমের স্পর্শে ভাষা মারা না যায় সে বিষয়ে, আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এ বিপদ এড়াবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মুখের ভাষার কাছঘেঁসে থাকা।

প্রবন্ধ লেখক মহাশয় ইঙ্গিতে বলেছেন যে নূতনের প্রতি টান বশতঃই আমরা নূতন মত প্রচার করেছি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, নূতনের প্রতি অনুরাগ বশতঃ আমি বাংলা-ভাষার গুণকীর্ত্তন করতে প্রবৃত্ত হই নি, বাংলা-ভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃই নূতন মত প্রচার করতে বাধ্য হয়েছি। ভাষার রূপগুণ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা

নির্ণয় করা যায় না,—এর জন্যে রুচিও চাই। বাংলা-ভাষার সুর আমার কাণে মিষ্টি লাগে—এবং তার গতির ভিতর আমি অপূর্ব্ব প্রাণের পরিচয় পাই বলেই, দেশসুদ্ধ ভাষাপণ্ডিতে একজোট হয়েও আমার মন থেকে সে—মায়া কাটিয়ে দিতে পার্‌ছে না ;—কেননা যা প্রত্যক্ষ তা কেউ অপ্রমাণ করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে আমরা পূর্ব্ব পক্ষের কথা উপেক্ষা কর্‌তে পারি নে ; এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁদের যুক্তিতর্কও মেনে নিতে পারি নে।......কাজেই ওঠে তর্ক।

বাংলা-ভাষার যে সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্যতা আছে, এ কথা যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরা নিত্যই এ ভাষার নানারূপ ত্রুটি ও দৈন্যের বিষয়ে আমাদের সচেতন করিয়ে দেন। তর্কের খাতিরে আমাদের মাতৃভাষার হীনতার কথা মেনে নিলেও সে ভাষাকে সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে তিরস্কৃত করবার কোনও কারণ আমরা দেখতে পাই নে। পৃথিবীর কোন ভাষাই সর্ব্বগুণে গুণান্বিত নয়, এবং তুলনায় সমালোচনা করতে গেলে, ভাষা মাত্রেরই কোন না কোন ত্রুটি ধরা পড়ে! ফরাসী-ভাষায় যে Paradise Lost রচিত হতে পারত না—এ বিষয়ে বোধ হয় ইউরোপে সকলে এক মত, কিন্তু তার জন্য ফরাসী সাহিত্য লাষ্ট ক্লাশে পড়ে যায় নি। অপর পক্ষে Musset-এর Comedies & Proverbs ও ইংরাজি ভাষাতে রচিত হতে পারত না। কিন্তু তার জন্য ইংরাজি সাহিত্যের ও মাথা নীচু হয়ে যায় নি। তা ছাড়া Divina Comedia কি ফরাসী কি ইংরাজি কোন ভাষাতেই রচিত হতে পার্‌ত না—কিন্তু তাই বলে ইতালীর সাহিত্য ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। এ সব কথা যদি সত্য হয় তাহলে সংস্কৃতের তুলনায় বাংলা-ভাষা দীনাহীনা, এ কথা বলার কোনই সার্থকতা নেই। আমি স্বীকার করি যে

স্বয়ং কালিদাসও বাংলা-ভাষায় মেঘদূত রচনা করতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বৈষ্ণব পদাবলীও ত সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হতে পারত না। আমার এ কথা যে কতদূর সত্য তা চণ্ডীদাসের সঙ্গে জয়দেবের তুলনা করে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন। পৃথিবীর অপর সকল বস্তুর মত ভাষাও দোষগুণে জড়িত। যে ভাষায় যা নেই তার উপর নয়, যা আছে তার উপরেই সাহিত্য গড়তে হবে। লেখকের পক্ষে ভাষার ত্রুটী নয় তার শক্তিরই সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন। প্রতিভার অপেক্ষায় বসে' থাকার অর্থ সেই লেখকের জন্য প্রতীক্ষা করা যাঁর হাতে বাংলা-ভাষার সকল শক্তি ফুটে উঠবে। ইতিমধ্যে অবশ্য আমরা হাত গুটিয়ে বসে' থাকতে পারব না;—কেননা প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া না হওয়া অদৃষ্টের কথা। শুধু তাই নয়, প্রতিভার কর্ম্মক্ষেত্রের জমি আগে থাকতেই তৈরি করে রাখতে হয়।

সম্পাদক।

পরমায়ু।

——:০:——

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের মানুষ যারা
তাদের প্রাণের ঝর্‌না স্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাজার-ধারা
চল্‌চে বয়ে চতুর্দ্দিকে। কালের যোগে নয় ত মোদের আয়ু,
নয় সে কেবল দিবস-রাত্রির সাতনলী হার, নয় সে নিশ্বাস বায়ু।
নানান্ প্রাণের প্রেমের মিলে নিবিড় হয়ে' আত্মীয়ে বান্ধবে
মোদের পরমায়ুর পাত্র গভীর করে' পূরণ করে সবে।
সবার বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহুদূরে,
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় বিচিত্র আনন্দ রসে পূরে;
অতীত হয়ে' তবুও তারা বর্ত্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই ত যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়

তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাক্‌তে দিনের আলো,—
বলে' নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েচি, ডুব দিয়েচি, ঘট ভরেচি, নিয়েচি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

একটি ঘটনা।

—ঃ০ঃ—

সকাল বেলা দোকানে বসিয়া আমরা কয়েকজন বন্ধুতে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলাম। একটী ছোট ছেলে দরজার কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল—একটী পয়সা বাবুজী।

ছেলেটীর বয়স ৭।৮ বৎসর। তার গৌর নধর দেহ ধূলিমলিন; কেশ দীর্ঘ ও ঘন, কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত। ভগবান যাহাকে রাজপুত্র সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, সমাজ কৌপীন পরাইয়া এই সুকুমার বয়সেই তাহার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি চাপাইয়া দিয়াছে।

একটা গান কর—পয়সা দেব, বলিয়া সুরেশ একটা পয়সা দেখাইল।

গান জানিনে ত বাবু—

নাচতে জানিস্?

না বাবু।

তবে ভাগ্ এখান থেকে।

ছেলেটী কিন্তু চলিয়া গেল না। বয়স অল্প হইলেও ইতিমধ্যেই সে বুঝিয়াছে যে এত অল্পে অভিমান করিলে তাহার চলিবে না। মিনতিপূর্ণ দুটী চক্ষু সুরেশের দিকে তুলিয়া সে আবার বলিল—একটা পয়সা দাও, ও বাবু।

আব্দার পেয়েছিস্—ভাগ্ বলিয়া ধমক দিয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সুরেশ চা খাইতে লাগিল।

যাহার বয়স আবদার করিবার—আব্দার করা তারও অপরাধ! কে তাহার আবদার শুনিবে! ভিক্ষা যে কেহ দিতে পারে—আবদার ত যে কেহ শুনিতে পারে না।

কেন জানিনা বালক কিন্তু সুরেশের মুখের দিকেই চাহিয়াছিল আর কেহ ত রূঢ় কথাটীও তাহাকে বলে নাই!

পিয়ালা হইতে সুরেশকে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে আবার বলিল—একটা—

পিয়ালার অবশিষ্ট গরম চা, সুরেশ বালকের গায় ঢালিয়া দিয়া বলিল—কেমন? ধরেছিস্ ত? নে এইবার—

তাহার সেই অদ্ভুত ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া হরিশ বলিয়া উঠিল—কি বাহাদুরীই হ'ল ওর গায়ে চাটুকু ঢেলে!

নরেন সেই সুরেই আরম্ভ করিল—আহা বেচারী, কোন ত্ জোর নেই, ওর—

ছেলেটী কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—এও সেই আবদারের সুর। তবে আরো করুণ আরো মর্ম্মস্পর্শী। সে সুর অনেকের প্রাণে বাজিল—পথের পথিক পর্য্যন্ত চকিতে চাহিয়া দেখিল কিন্তু সেই অর্দ্ধ-উলঙ্গ ভিখারী বালককে দেখিয়া আর কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না।

প্রায় নির্ব্বিকার ভাবে পকেট হইতে একটী আনি বাহির করিয়া সুরেশ বালকের গায় ছুড়িয়া দিল। বলিল—চলে যা এখান থেকে চেঁচাস্ নে আর—ও গান আমরা শুনতে চাই নে।

ভয়ে ভয়ে বালক চুপ করিল—তাহার কান্না আর শোনা গেল না। কিন্তু বোঝা গেল যে সে তখনো কোঁপাইতেছে। এ কোঁপানীও

ক্রমে থামিয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শেষবার সুরেশ ও আমাদের দিকে চাহিয়া শেষে উঠিয়া গেল।

তাহার চোখের জল তখনো শুকায় নাই কিন্তু ভিক্ষা পাইয়া যে সে কৃতার্থ হইয়াছিল সেই চোখের কোণেই সে কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

ধরতাই বুলি।

—:*:—

এ কথাটা বাংলার সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাক্‌লেও, কথাটায় যা বোঝায় তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে ; এবং মানুষে ধরতাই বুলির উপর যে বিশ্বাস খরচ করে, সেটা যদি নিজের জন্যে জমিয়ে রাখ্‌ত তা হলে পৃথিবীতে এত দুঃখ কষ্ট থাক্‌ত না। সত্ত্ব, রজ, তম, সোঽহং প্রভৃতি বচনগুলি যে ছাত্র সমাজে, বৃদ্ধের দলে, মাসিক পত্রিকায় স্বদেশী বক্তৃতায় কতবার আওড়ান হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার ইংরেজী শিক্ষিতের দলেও ধরতাই বুলি ছাড়া কথাই নেই। রাজভাষার এমনি মজা যে ওর বুক্‌নী শিখলেই সে ভাষায় ব্যুৎপত্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া যায়—শুধু তাই নয় বাঁধিগৎ এর বন্ধনে ভাবের গলায় যে দড়ী পড়ে তাও সম্পূর্ণভাবে ঢাকা যায়। এ সত্যের প্রমাণ খুঁজতে প্রয়াস পেতে হয় না, দৃষ্টান্তের ও অন্ত নেই। যে সব উচ্চ-শিক্ষিত যুবকেরা বাংলা লিখ্‌তে অনুরোধ কর্‌লে উত্তর দেন "বাংলা আমি জানিনে" তাঁদের ভিতর শতকরা ৯৯ জন ভদ্রলোক সেই সঙ্গে মনে মনে বলেন "ইংরেজীটা জানি, তাই ধরেই আমার মনের কথাগুলো হুড় হুড় করে বেরুবে, মানুষে একসঙ্গে ক'টা ভাষা শিখতে পারে"। তাঁরা যখন বিদেশী ভাষায় কোন প্রবন্ধ লেখেন তখন মনে হয় "বেশ হল" কিন্তু যখন ঐ প্রবন্ধটা বাংলায় তর্জ্জমা করে পড়ি তখন মনে হয় সাহিত্যের অরন্ধন ভক্ষণ হচ্ছে। বাংলা দলের পক্ষেও ঐ কথাটা খাটে। মাসিকপত্রে সচরাচর যে সব প্রবন্ধ বেরোয় তাদের তর্জ্জমা

করলে মনে হয় "Census report-এর কথাগুলো খাঁটি, দেশে বাস্তবিকই অনেক সন্তান জন্মায়, কিন্তু তাদের মধ্যে শতকরা এক আধজন বাঁচে"।

যাই হোক্ মোদ্দা কথাটা এই যে আমরা বুলি গুলো না বুঝে, না বাজিয়ে, মনের উপর তাদের কি রকম প্রভাব তা না জেনে, সে গুলো চালাতে চাই। সাধারণ লোকের হাতে বনমানুষের হাড় যেমন শুধু হাড়ই থেকে যায় তা দিয়ে কোন খেলা দেখান যায় না, তেমনি আমাদের হাতে ইংরেজী সংস্কৃত বুলি গুলো, শুধু বুলিই থেকে যায়—তা দিয়ে জীবনের কোন খেলাই খেলা যায় না। এই যেমন Evolution; যখন Politics আলোচনা করি (অবশ্য অন্য দেশের) তখন বলি এই প্রজার পরোক্ষভাবে রাজ্য শাসন করবার প্রথাটা হঠাৎ আসে নি, এর একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে; যখন সমাজ সংস্করণের কথা ওঠে তখনও বলি "আচার কি আর ব্যাঙের ছাতা, যে রাতারাতি ভুঁইফুড়ে উঠেছে, এরও একটা ক্রমবিকাশ আছে" এই রকম বিবাহের, এমন কি ভগবানের ও নাকি Evolution আছে শোনা যায়।

আছে জানি, কিন্তু কি আছে নেড়ে চেড়ে দেখা যাক্। Evolution শব্দের মানে হচ্ছে কর্ম্মফল, যদিও ওর প্রতিশব্দ হচ্ছে অভিব্যক্তি। ধার্ম্মিকের কাছে "কর্ম্মফল" শব্দটা উচ্চারিত হলেই যেমন তাঁর বুদ্ধির আয়নার ঘাম মুছে যায়, তেমনি ইংরেজী পড়া লোকেদের কাছে এই কথাটার মন্ত্রশক্তিতে সকল তর্কের মীমাংসা হয়ে যায়। ঐ একটি কথার জোরে সকল সমস্যার বাইরে চলে যাওয়া যায়। আমি আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি "ও কথাটার মানে কি বুঝিয়ে

দিতে পার ?” তিনি বল্লেন “ভাল করে বুঝতে গেলে অনেক কাঠ খড় চাই —তা তুমি যোগাতে পারবে না, তবে এই দুটো কথা শিখে রাখ survival of the Fittest আর Struggle for Existence”—তাহলেই ওর মোদ্দা কথা শেখা হবে।

“এ, ত কেবল নিয়মগুলো”

“ওই হল; আর কিছু বোঝবার দরকার নেই, বাস্তবিক পক্ষে Evolution বুঝতে আমরা তার নিয়মই বুঝি, কিন্তু আসৎ জিনিসটা সম্বন্ধে আমার খুব সাফ্ ধারণা নেই—বোধ হয় ক্রমবিকাশ বল্লে ভুল হবে না”

“না আমি প্রতিশব্দ চাই না, কথার মানে অভিধানেই দেওয়া আছে, কিসের ক্রম বিকাশ বুঝিয়ে দিতে পার ?”

“এই ধর মানুষ, বাঁদরের”

“এই রকম করে কতদূর পিছু হটতে পার ?”

“Cells পর্য্যন্ত”

“অর্থাৎ যতদূর অনুবীক্ষণে দেখা যায় ; তার বেশী না ?”

“এক পা'ও নয়”

“আর, কতদূর এগোতে পার ?”

“মানুষ পর্য্যন্ত ; তার বেশী এক পা'ও নয়, সব জ্ঞানই ত সীমাবদ্ধ তার উপর আবার বিজ্ঞান, তবে এই মাত্র কথা, অভিব্যক্তি-বাদে বিশ্বাস করতে গেলেই মেনে নিতে হবে যে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পূর্ণ বিকাশের লোভে মন্থরগতিতে এগোচ্ছে—অর্থাৎ উন্নতি করছে”

“ওটা তোমার নিজের কথা—বুকনীর বাইরের কথা। কোন একটা ভাব বুঝতে গেলে তার অভাবের স্বভাব বুঝতে হবে। যেমন 'প্রকা-

শের ব্যাথা' বল্লেই 'অপ্রকাশের আনন্দ' ভাব মনে জাগে। কিন্তু বিজ্ঞানে 'নেতি'র দিক্ হচ্ছে উত্তরায়ণ, সে ধারে কোন কাজ হয় না। শুধু কাজ হয় না তাই নয় ও ধারটা যে আছে তাও তোমরা মানতে রাজী নও, এই বলে উড়িয়ে দিতে চাও যে Struggle হচ্ছে অবিকাশের বিপক্ষে। কিন্তু এ সত্য ভুলে যাও যে, পৃথিবীতে জীবনের বিকাশের বাধার নিয়মাবলীকেও ইভলিউসানের নিয়ম বলা যেতে পারে। আর Involution বলে যে একটা process আছে এও মানতে হবে। তোমরা বল মানি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মান না। আবার আর এক কথা, ওই অভিব্যক্তি আর অনভিব্যক্তির মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে যার নাম হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা, নিশ্চলতা। চীন সভ্যতা ৪০০০ বছর আগেও যা ছিল এখনও তা আছে, এ ক্ষেত্রে তোমার ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী কি করে খাটাচ্ছ?"

"কি জান, আমার মাথায় এ বিষয়ের এ দিক ও দিকের ভাবগুলি তেমন সাজান নেই"

"তা বেশ জানি, তবে আমার মাথাও ঐ বিষয়ে যে বেশী পরিষ্কার তা নয়—যাই হোক্ আমি এই অস্পষ্টতার কারণ দেখাতে পারি"

"দেখিয়ে কোন লাভ নেই, যদি অভিব্যক্তি-বাদের অস্পষ্ট কথা গুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারতে তা হলে কিছু positive জ্ঞান লাভ হত। negative-criticism করা যেমন সোজা, করাও তেমনি বৃথা"

"এও আর একটা বুলি।—আমি কারণ দেখাচ্ছি, আমার মাথা ও তোমার মাথায় যে পরগাছা জন্মেছে তার উচ্ছেদ সাধনের জন্যে—ফুল-গাছের তোয়াজ মানে তার গায়ে কাগজের ফুল গেঁথে দেওয়া নয়—

তার মাথা মাঝে মাঝে ছেঁটে দেওয়া আর তার গোড়ার মাটি ঢিলে করে দেওয়া। মনের দেশেও ভাবের ফুল ফোটাবার ঐ একই পদ্ধতি।

"হয়েছে, কি বলবার আছে বল দেখি"

"আমার প্রথম আপত্তি—ইংরেজী কথার দাসত্ব জিনিসটেতে। এক একটি বচন যেন জালের কাঠ, জ্ঞানের বন্ধনের অপেক্ষাও এর বাঁধন শক্ত।

দ্বিতীয় কথা এই :—Darwin-এর মত সম্বন্ধে কতক ভুল ধারণাই তাঁর মত বলে চলে যাচ্ছে। তাঁর প্রথম ও শেষ কথা এই যে, জীবদেহে অদ্যাবধি যে বদল ঘটেছে, তারই ইতিহাসের নাম ইভলিউসান। সেটা কখনও Moral thesis হতে পারে না যাতে করে আমরা তার রীতিকে নীতি হিসেবে গণ্য করে মানব জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ইতিহাস দাঁড় করাতে পারি ; অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করলে মনে অনেক দুরূহ প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি আসে বটে কিন্তু তাই বলে যে সে মতের উপর নির্ভর করে কোনও চেতন পদার্থের বিকাশের সাহায্য হতে পারে এটা বিশ্বাস করি না। তুমি কি মনে কর যে Darwinism সংক্রান্ত কোনই বই পড়িয়ে আমাদের মত নির্জীব জাতিকে সজীব করতে পারা যায় ?

"হাঁ এক হিসেবে পারা যায়, অনবরত "Struggle-এর কথা শুনতে শুনতে যদি মন নড়ে ওঠে"

"কতকটা সত্যি বটে, কিন্তু Darwinism বুঝতে শুধু Struggle for Existence-ই বুঝি কেন ? ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরস্পরের সাহায্য করবার ইচ্ছা তার কত বড় পাতা অধিকার করে রয়েছে তা স্বয়ং Darwin কি Wallace স্বীকার করলেও আমরা স্বীকার করি

নে। এঁদের মধ্যে একজন এক যায়গায় বলছেন "Those commities which included the greatest number of the most sympathetic members would flourish best" এই একটা লাইন দেখলেই মনে হয় যে Darwin হচ্ছেন বিজ্ঞান ধর্ম্মের যীশুখৃষ্ট, অর্থাৎ তার মতের তিনিই শেষ মতাবলম্বী। পূরো সত্যের ইতিহাস হচ্ছে মানুষের জীবন, আর খণ্ড সত্যের ইতিহাস Inquisition, Thirty Years' War আর বর্ত্তমান যুদ্ধ; এ যুদ্ধ ইভলিউসানের ফল নয় ইভলিউসানবাদের ফল। ধরতাই বুলি খণ্ড সত্য, তাই তার গল্পের পাতা রক্ত দিয়ে লেখা; Balance of Power কি Liberty-র গল্প কি জান না?"

"আরও কিছু বলবার আছে না কি?"

"আরও একটি আছে—সেটা বড় শ্রুতিকটু। বাঁধা বুলির প্রধান সহায় হচ্ছে আমাদের বোকামী। আমরা বড় বুদ্ধিমান বলে বড়াই করি—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আমরা চালাক হলেও বুদ্ধিমান নই। বুদ্ধিমত্তার রাজচিহ্ন হচ্ছে সূক্ষ্মভাব ধারণের সক্ষমতা। আমরা কিন্তু দা-কাটা Facts ছাড়া আর কিছু নিয়ে মনের কারবার করতে পারি নে।

"সে কি! আমাদের দেশে যে উপনিষদ লেখা হয়েছে, আমাদের জীবনই ত একটা abstraction."

"হাঁ লেখা হয়েছে বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়, কেবল তাই নয় উপনিষদ পড়ে কজন লোক খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে?—এ কথা আমি খুব বড় গলা করে বলতে পারি যে যদিও আমরা বেদান্ত বেদান্ত করে মরি তবু আমরা সকলেই কৃষ্ণভক্ত; এমন কি কৃষ্ণজ্ঞান ও নই।

বৈষ্ণব গ্রন্থের এত আদর কিন্তু বৈদান্তিক গ্রন্থের আদর নেই কেন? এত সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক হচ্ছে কিন্তু দার্শনিক কৈ? যখনই রবি বাবুর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি ঋষি কি না এই নিয়ে ওঠে তর্ক—তাঁর কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য যে কোথায় সে কথা কারুর মুখেই শুনি নে; তার কারন কি জান? রবীন্দ্র নাথকে কবি হিসেবে বিচার করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই তাঁকে আমরা মানুষ হিসেবে বিচার করতে বসি। উপর উপর দেখ্‌তে মনে হয় সমালোচকের স্থান গ্রন্থকারের অনেক নীচে, কিন্তু আসলে তা নয়।

"হাঁ একটা কথাই আছে Bad authors turn critics."

"ও বচনটাও ধরতাই বুলি আর সেইজন্যেই খণ্ডসত্য; বাস্তবিক পক্ষে সমালোচকের কাজও মনের কাজ, এবং সে কাজেরও যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে। তাঁকে যুক্তির সূক্ষ্ম পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়, Ideas নিয়ে লোফালুফি করতে হয়।"

"আর সেইজন্যেই বোধ হয় সাহিত্যের আসরে সমালোচককে Clown কি বিদূষকের মতন দেখায়।"

"কিন্তু তুমি কি জাননা সার্কাসের Clownরাই হচ্ছে পাকা ওস্তাদ।"

"সব কথাত শুনলুম এখন বলতে চাও কি?"

"এতক্ষণে তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তা হলে আমার বকাই বৃথা হয়েছে, একটু নিজে ভেবে দেখ—আমাদের মাষ্টার মশায় বলতেন 'ওহে একটু মনের পা ঘামিয়ো তা হলে কপালের ঘাম পায়ে

পড়বে না।' আমরা যাকে বোকামি বলি তা মনের আল্‌সেমি ছাড়া আর কিছু নয়।

"কিন্তু উপদেশটি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোন অধার্ম্মিকের, আমাদের ধর্ম্মে, সর্ব্বদা মনকে শান্ত করতে বলে আর সেইজন্যে—

"শান্তিতে শুধু থাকিবারে চাই
একটি নিভৃত কোণে।"

"তোমার শান্তির মানে জানি। মনের কুঁড়েমীকে অন্য নাম ধরে ডেক না, তাহলে সে উত্তর দেবে না। কিম্বা বুলিগুলোকে অত যখের মতন মনের প্রহরী করে রেখোনা; যখের ধন কেউ নিতে পারে না ঘটে, কিন্তু সুদে বাড়ে না।"

"তোমার মতে ত ইভলিউসানও একটা বুলি। কিন্তু এটা কি জানোনা যে একালে ইভলিউসান বাদ দিয়ে আমরা চিন্তাই কর্‌তে পারি নে।"

"তাজানি, সেইজন্যেই ভবিষ্যতে আমাদের ইভলিউসানের বাইরেই চিন্তা কর্‌তে হবে, নচেৎ পৃথিবীর ছোটবড় অনেক সত্য, আমাদের মনের বাইরে থেকে যাবে।"

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

টী-পার্টি।

—:*:—

ব্যক্তিগণ :—

অক্ষয়	...	হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ; Chicago-ফেরৎ।
ভূপেন্দ্র	...	সঙ্গতিপন্ন সাহিত্যিক।
সত্যব্রত	...	বিজ্ঞানে পণ্ডিত।
হিমাংশু	...	ব্যারিষ্টার।
পুণ্ডরীকাক্ষ	...	Antiquarian।
দেবকুমার	...	বেকার ও সবজান্তা।

স্থান :—ভূপেন্দ্র বাবুর বাসভবন।

দে। (চা খেতে খেতে) আচ্ছা, আপনারা কি বলেন? চাটী বেশ উপাদেয় হয়েচে না?

পু। খাসা লাগ্‌চে, ডার্জিলিং চায়ের মতন flavour।

ভূ। তাই বটে। এখানে দোকানে যে সব চা বিক্রী হয় তার চাইতে ভাল মনে হ'ল বলে খাস্ ডার্জিলিং থেকে সেদিন দশ পাউণ্ড নিয়ে এলুম।

পু। সখও ত মন্দ নয়! চা আন্‌বার জন্যেই অতদূর গেছলেন নাকি?

ভূ। না, ততটা নেশা ধরে নি। বেড়াতেই গেছলুম ; আসবার সময় খানিকটে চা সঙ্গে আনা গেল।

হি। মজা দেখেচেন? এই চা ই আবার ডার্জ্জিলিঙে তৈরী করলে এখানকার মতন এত ভাল হয় না।

ভূ। বড্ড শীত কিনা।

স। এবার ওখানে খুব শীত পড়েছিল, না?

পু। কোন্ বারই বা কম পড়ে?

স। ওইটে আপনাদের ভুল বিশ্বাস। খবরের কাগজে যে Meteorological report দেয় সেটা কি সম্পূর্ণ বাজে?

দে। তা না হয় মানা গেল যে খুব শীত হয়েছিল, আপনার গায়ে ত আর লাগে নি?

হি। ও আর শীত কি? বিলেতে অমন সময় বরফ পড়ে।

অ। তেমন শীত আমাদের দেশে না হওয়াই ভাল।

হি। কিসে ভাল? এদেশটা যদি আর একটু ঠাণ্ডা হ'ত তাহলে বাঙালীরা এত কুঁড়ে হয়ে যেত না।

অ। মানে বুঝচেন না, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা যদিচ বেশী খাট্‌তে পারে, তাদের মধ্যে lungs-এর অসুখের প্রাদুর্ভাব বেশী।

ভূ। তা আপনার মতন ডাক্তার থাক্‌লে অসুখের বড় ভয় থাকে না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মস্ত গুণ হচ্চে, তার দ্বারা রোগের উপশম হোক্ না হোক্ রোগের বৃদ্ধি হয় না।

অ। কি জানেন, য়্যালোপ্যাথীতে সবই অন্ধকারে ঢিল মারা। দেখবেন, আর বিশ বৎসরের মধ্যে ওদের কেবল Surgery-টুকু থাকবে; আর ওষুধপত্র সব হোমিওপ্যাথিক হয়ে যাবে। এই এখনই দেখুন না, Injectionটা আমাদেরই "বিষে বিষক্ষয়" principle-এর

ওপর base করা। ওঁরা ওষুধ ফুঁড়ে দেন, আমরা গিলিয়ে দিই, এই যা তফাৎ।

দে। অনেকে আবার mixed treatmentও করেন। এই সেদিন আমার এক বন্ধুর গা-হাত-পা কাম্‌ড়ে জ্বর এল; একটী ডাক্তার—নাম কর্‌ব না—এক ফোঁটা Aconite ও একটী Aspirin-এর বড়ির ব্যবস্থা কর্‌লেন। জ্বর ছাড়্‌লে দিনকতক রোজ সকালে এক মোড়া করে মকরধ্বজ মধু দিয়ে মেড়ে খেতেও বলে গেলেন।

অ। তাঁর বোধ হয় কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। অথবা জান্‌তেন না যে একটী ফোঁটা Rhus Tox 30th. দিলেই হ্যাঙ্গাম মিটে যেত।

হি। আঃ, কি মিছে বাজে বক্‌চেন? চা খাবার সময় অসুখ ওষুধের গল্প করে মন খারাপ কর্‌বার দরকার কি? বিলেতে কোন পার্টিতে ও রকম গল্প করাটা বেয়াদবি বলেই গণ্য হয়।

দে। সেটা ঠিক্। বিলেত, অতদূর যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশেই মুসলমানদের ভিতর ওসব বলবার যো নেই।

পু। হাঁ, মুসলমানেরা সবেতেই কায়দাদোরস্ত।

ভূ। তার মানে, ওদের জাতটা ত বেশী দিন পূর্ব্বে স্বাধীনতা হারায় নি; সুতরাং কায়দা কানুনও বোঝে, virilityও আমাদের চেয়ে বেশী আছে।

স। সে আবার কতকটা আহারের গুণেও বটে। এই ধরুন না মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, এই সব খাওয়ার রেওয়াজ আজকালকার হিঁদুর ছেলেদের মধ্যেও হয়েচে, আর তাতে করে তাদের শরীরও ভাল হচ্চে।

পু। ও বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ওসব গরম জিনিস খাওয়া যদি ভাল হ'ত তাহলে কি আমাদের শাস্ত্রে নিষেধ থাকৃত? কি বলেন, অক্ষয় বাবু?

ভূ। অক্ষয় বাবু 'হঁ্যা'ই বলুন আর 'না'ই বলুন, যা চলে গেছে তার ত আর চারা নেই? আর ঐ শাস্ত্র দেখিয়ে দেখিয়েই ত আমাদের দেশটা উচ্ছন্ন গেল।

হি। You're quite right—ঠিক্ বলেচেন। ইংরেজরা অত বড় জাত কেন জানেন? ওরা কথ্খন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে কথা কয় না।

স। কথ্খন না। ওরা গতানুগতিকের দাস হলে কি Science জিনিসটা তৈরী হ'ত? ওদেরই ঘরে ত বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আর আজ এত বড় হয়েচে'।

পু। তা কিন্তু আপনি বল্‌তে পারেন না। রামায়ণ মহাভারতের সময়ে aeroplane, machine-gun, asphyxiating gas, barbed wire entanglements, সবই এদেশে জানা ছিল। এখন আর পুষ্পাক রথ, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, নাগপাশ, এ সব কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কৌটিল্য পড়্‌লে জানা যায় প্রাচীন ভারতে যে রকম গুপ্তচরের বন্দোবস্ত ছিল তা থেকে জর্ম্মাণরাও spy-system কিছু শিখ্‌তে পারত। এমন কি আর্য্যেরা wireless telegraphy জান্‌তেন এও প্রমাণ করা যায়।

ভূ। না; ততটা বোধ হয় সহজে প্রমাণ করতে পারেন না।

পু। সে আর শক্তটা কি? মুনি-ঋষিরা তপস্যাবলে বর পেতেন যে তাঁরা অভীষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর্‌লেই তাঁর "টনক্" নড়্‌বে, আর

তিনি এসে হাজির হবেন। এর থেকেই প্রমাণ হচ্চে যে telegraphy ছিল। এবং যখন পুরাকালের কোন wire খুঁজে পাওয়া যায় নি, তখন নিশ্চয়ই telegraphy টা wireless ছিল।

স। হ্যাঁ, এ যুক্তিটা আপনার অকাট্য! কিন্তু আমি যতগুলো telegraphyর ওপর বই পড়েচি তাতে একবারও এ কথা বলা নেই। অন্তত Hertz বা Marconiরও ত স্বীকার করা উচিত ছিল।

দে। বোধ হয় অতটা তাঁরা খবর রাখ্‌তেন না!

পু। তা ওরা জান্‌লেও কখন স্বীকার করতে চায় না। ওদের যে-কোন একটা ইতিহাসের বই খুলে দেখুন, লেখা আছে যে ইউরোপে যা কিছু ভাল ব্যবস্থা বর্ত্তমান,—সে কি সাহিত্যে, কি দর্শনে, কি স্থপতি-বিদ্যায়, কি ভাস্কর্য্যে,—সবই গোড়ায় গ্রীস্‌ হ'তে আমদানী হয়েছিল। অথচ গ্রীস্‌ যে এখান থেকে, পারস্যদেশ থেকে, কত কি ধার করেচে তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি, বাঙ্গালী ঐতিহাসিকেরাও প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত যে ভারতবর্ষে যা কিছু আছে তা সবই বিদেশী,—মায় মানুষ-গুলো পর্য্যন্ত।

ভূ। এই হাল্‌-ফিল্‌ এক ধুয়ো উঠেচে যে পাটলীপুত্রে অশোকের যে শতস্তম্ভ দরবার-ঘর মাটীর নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েচে সেটা নাকি Darius-এর Hall of a Hundred Pillars-এর হুবহু অনুকরণ। অতএব, অশোক পার্সী ছিলেন!

স। কোন্‌ দিন হয়ত শুন্‌ব যে বুদ্ধদেব চীনেম্যান্‌ ছিলেন!

পু। কথাটা একেবারে আজগুবি ঠাওরাবেন না। যত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায় তার অধিকাংশেরই চোখ ছোট, কপাল উঁচু, নাক থাঁদা,—

আর গোঁফ নেই। যদিচ, বোধিসত্বগুলোর গোঁফ আছে। এই থেকে ধরা যায় যে বুদ্ধদেব Mongolian raceএ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দে। তার কারণ এও হতে পারে যে China, Japan, Burma Siam এতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক প্রচার। সুতরাং যাঁরা বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো বেশীভাগ গড়েন তাঁরা নিজেদের নাক-চোখকে আদর্শ ভেবে সিদ্ধার্থের প্রতি ভক্তি বশতঃ তাঁকে নিজেদের মতন করেই গড়েন।

ভূ। হ্যাঁ, Mongolian artএ ওদের নিজেদের আকৃতি প্রকৃতি একটু বেশী প্রকট। Mongolian-দের আর একটা ব্যাপার দেখ্‌বেন, তাদের ঘরের প্রত্যেক জিনিসটীতে সৌন্দর্য্যবোধের ছাপ আছে।

পু। সৌন্দর্য্য বোধ আমাদেরই বা কম কিসে? ওরা art শিখ্‌লে কোত্থেকে? Mongolians-দের মধ্যে জাপানীরাই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? সেই জাপান ত গোড়ায় ছিল একটা বাংলা উপনিবেশ মাত্র।

দে। Okakuraও স্বীকার করেচেন যে জাপানীদের আর্ট ভারত-বর্ষ হ'তেই প্রাপ্ত।

ভূ। সে রকম ধরতে গেলে সব দেশই এদেশের কাছে ঋণী, এবং আমরাও অন্য দেশের কাছে ঋণী, আর আজকাল ঋণের ভার আমাদেরই বাড়্‌চে।

পু। আপনার কেবল ঐ এক কথা! আজই যেন আমাদের কিছু নেই,—ইউরোপের কাছে ধার করছি। যখন ওরা বল্কল পরে বেড়াত আর বনের পশু স্বীকার করে খেত তখন এদেশের লোকেরা কত সভ্য ছিল, সে কথা যে একেবারেই ভুলে যাচ্চেন!

হি। কি ছিল না ছিল তা জেনে কি হবে? বরং কি আছে সেই-টেরই ওপর নজর রাখা উচিত।

দে। ঠিক কথা। আমারও ত পূর্ব্বপুরুষদের জমিদারীর আয় যথেষ্ট ছিল। এখন কি তা আছে? তাঁদের বড়মানুষীর কথা এখন গল্প-কথার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েচে।

হি। আচ্ছা, আপনাদের গেল কি করে?

দে। সে আর বলে কি হবে? দুঃখ বাড়্বে বৈ ত আর কম্বে না। আমাদের তিনশ বছরের জমিদারী। দশ-শালা বন্দোবস্তের সময় আমার প্রপিতামহ হরকিঙ্কর, কোম্পানীর দেওয়ানকে ঘুস দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁর জমিদারীর সদর খাজনা দশগুণ বেড়ে গেল। তারপর ক্রমাগত ভাগ হয়ে হয়ে এখন গেরস্ত দাঁড়িয়ে গিয়েচি। তাই ত বল্‌চি, পূর্ব্ব-গৌরবের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

স। বেশ, না হয় তাই বিচার করা যাক্ না, যে কি আছে।

ভু। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব্বসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ দুটী জিনিস বজায় আছে,—the art of cooking and the art of music। এই দুই বিষয়ে ইউরোপ অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ হতে পারে নি।

দে। ও দুটী art এর কথা এক নিশ্বাসে বলা কিন্তু inartistic হল। সে দিন যেমন এক ভদ্রলোক লেক্‌চার দিলেন, poetry and Zoologyর ওপর!

ভু। আমি ইচ্ছে করেই বলেচি;—আমার রাঁধবার সখ আছে, কেবল তাই জন্যেই নয়। কোন দেশের যখন অধঃপতন হয় তখন সব যেতে পারে কিন্তু খাওয়া থেকে যায়। যেমন কোন লোকের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী হয়ে গেলেও বসতবাড়ীটী যেতে বিলম্ব হয়।

তবে হিন্দুদের সঙ্গীতটা কেন এখনও বজায় আছে তার ঠিক কারণ আমি খুঁজে পাই নি। বোধ হয়, মুসলমান রাজাদের পেয়ারে।

হি। তাই সম্ভব। দেশের রাজা ও দেশের বড় লোকেরা যদি পেয়ার না করেন ত কোন art-এরই উন্নতি হয় না।

ভূ। তাছাড়া মোগল সম্রাটেরা আবার art-এর দিকে বেশী নজর রাখ্‌তেন।

দে। সব art-এর নয়! Architecture-এই তাঁরা যা কিছু উন্নতি করেছিলেন। ও জিনিসটা পূর্ব্বে আমাদের দেশে তত জানা ছিল না। অর্থাৎ সাজাহান বাদসা যে রকম taste দেখিয়ে গেছেন তার পূর্ব্বে হিন্দুদের ত ওরকম ছিলই না, মুসলমানদের আমলেই কতকটা পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল মাত্র।

পু। তাজ-টাজের কথা বল্‌চেন ত? সেও আজকাল সকলে স্বীকার করেন না। Havell সাহেব স্পষ্টই প্রমাণ করে দিয়েচেন সে তাজের architecture পুরোদস্তুর বৌদ্ধ।

হি। Cooking, music, architecture সবেরই উপর ত বক্তৃতা হল; কিন্তু বাঙ্গলার যেটা সবচেয়ে সেরা জিনিস, literature, সেইটাই বাদ পড়্‌ল কেন? রবিবাবুর গুটিকতক কবিতার অনুবাদ পড়ে যে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হয়ে গেল এও ত বড় কম গৌরবের কথা নয়। ভুপেন্দ্র বাবুর এবিষয়ে কিছু বলা উচিত ছিল।

ভূ। দেখুন, সাহিত্যের—সে গদ্যই হোক্ আর পদ্যই হোক্, দুটো দিক্; form এবং spirit। অনুবাদে form থাকে না; কিন্তু spirit অনেকটা থাকে। Wickland যখন Shakspere-এর জর্ম্মণ অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন সেইটে পড়েই Goethe বলেছিলেন যে,

যার গন্থ-অনুবাদ এত সুন্দর তার মূল কাব্য নিশ্চয়ই অতি উঁচুদরের ; কেননা অনুবাদে মূলের সে শব্দ বৈচিত্র্য নেই যা মনকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। রবিবাবুর অনুবাদ পড়ে সব দেশের লোকেরাই মুগ্ধ হয়েচে, এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে যে ওঁর কাব্যের Spirit সার্ব্বজনীন। সেই Spirit টাই আর্টিষ্টের নিজস্ব, এবং তার জন্যে আর্টিষ্ট পূর্ব্ব-সভ্যতার কাছে ঋণী নন্। তাই সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছিলুম।

হি। কিন্তু Goetheর সময়ে আর্টিষ্টরা যেরকম জাতীয় জীবনের সঙ্গে সংস্পর্শ না রেখে থাক্‌তে পারতেন, Ibsen, Maeterlinck, Bernard Shawর সময়ে ততটা পারা সম্ভব নয়। তাঁরা Spirit of the age এর স্রোতে গা ঢেলে দিতে বাধ্য হলেন।

ভূ। এবং সেই জন্যেই তাঁরা উচ্চসাহিত্য গড়্‌তে পারলেন না।

পু। গড়্‌লেই বা কি লাভ হত? ওসব করে কি জাত বড় হতে পারে ? নাটক পড়ার চেয়ে পাঁচখানা অন্ধ্র dynastyর ওপর বই পড়লে কাজ হয়। আমাদের হয়েছে কি, Nova Zemblaয় কত ডিগ্রী ঠাণ্ডা তা জানি, William the Conqueror থেকে ইংলণ্ডে যতগুলি রাজা হয়ে গেছেন তাঁদের নাম মুখস্থ বল্‌তে পারি, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের date কি তা নিয়ে যুক্তি বিচার করে দেখি না।

হি। তা বটে। আমাদের যা শিক্ষা হচ্চে তা যে একদেশদর্শী তার আর সন্দেহ নেই।

ভূ। মাফ্ করবেন, কিন্তু সেটার জন্যে আপনারাও অনেক পরিমাণে দায়ী। এই সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গেলেন, আর শিখ্‌লেন কি না ল'! দ্বারিক মিত্তির, রমেশ মিত্তির, স্যর্ রাসবিহারী, স্যর্ আশুতোষ, এঁরা এইখান থেকেই যা আইন শিখেচেন ও লোককে

শিখিয়েচেন তার চেয়ে কি আইনজ্ঞান আপনার বেশী হয়েচে? ল' পড়্‌তে বিলেত যাওয়া national economy নয়। আইনের ব্যবসাটীও national point of view থেকে অর্থকরী নয়। কেবল একজনের ট্যাঁক হাল্‌কা করে আর একজনের ট্যাঁক ভারি করা।

হি। কিন্তু এক হিসেবে আমরা দেশের উপকার কচ্চি। ধরুন, যদি আমরা ব্যারিষ্টার না হতুম ত যে টাকাগুলো আমরা পাচ্চি তা ইংরেজ ব্যারিষ্টারদের পকেটে যেত।

স। তথাপি, যদি ব্যারিষ্টারী না পড়ে কিছু Science শিখতেন তাহলে দেশের আরও বেশী টাকা বাঁচাতে পারতেন। দেশে যত উকীল ব্যারিষ্টার হয় ততই লোকেরা মামলাবাজ হয়ে ওঠে।

হি। কিম্বা দেশের লোকেরা যত বেশী মামলাবাজ হয়ে ওঠে ততই উকীল ব্যারিষ্টারের দরকার হয়!

ভূ। ও বিষয়ে এমন কিছু statistics নেই যা আশ্রয় করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানরত্ন উদ্ধার করবার জন্যে যে সমুদ্র-মন্থন প্রয়োজন একথা অস্বীকার করা যায় না। বিলেতে না গেলে কি আর জগদীশ অত বড় লোক হতে পার্‌তেন?— গাছের ভাষা মানুষের বোধগম্য হত?

দে। ওটা আমি মানি না। গাছের জীবন আছে এ আইডিয়াটার জন্যে সাগর পারে যেতে হয় নি।

হি। কেবল idea পেলে কি হবে? আইডিয়াকে কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হলে—বিশেষতঃ Scienceএ,—ঘরের কোণে বসে থাকলে চল্‌বে না।

অ। এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিষয়ে আরো বেশী রকম খাটে।

পু। কেন, আয়ুর্ব্বেদ ত চতুর্ব্বেদের উপসংহার বলে স্বীকৃত হয়েচে। আজকাল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ হলে মহামহোপাধ্যায় উপাধিও মেলে।

অ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না কবিরাজেরা নিজেদের মনগড়া "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ" "আমরাক্ষসী" ইত্যাদি নামকরণে বিরত হচ্চেন, ততদিন আয়ুর্ব্বেদকে Science ব'লেই মনে হবে না। কি বলেন, সত্যব্রত বাবু?

স। সে কথা সত্যি। তা ছাড়া প্রকৃত বিজ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান যেটাকে আজ সত্য বলে মেনে নিচ্চে, কাল যদি সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়, বিজ্ঞান সেটা মিথ্যা স্বীকার করতে বাধ্য। আয়ুর্ব্বেদে কতদিন আগেকার ধারণা লিপিবদ্ধ রয়েচে, সে ধারণাগুলো একবার revise করে দেখে, এমন লোকও এখানে নেই।

ভূ। অনেক ক্ষেত্রে আবার আমরা পূর্ব্বমত সংশোধন করতে গিয়ে শুদ্ধটাকে অশুদ্ধ করে ফেলি। এই যা বলছিলুম, art of cooking আর art of music-এ জগতে আমাদের তুলনা নেই। রান্নার রীতি বা গানের পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন আধুনিক সভ্য দেশকে অনুকরণ করতুম তাহলে মোচার ঘণ্টও খেতে পেতুম না, আর ভৈরবীর মিষ্টি আলাপও শুনতে পেতুম না।

দে। অনুকরণ যে ঐ দুই বিষয়ে করি না, তাও বলতে পারেন না। এই যে এখানে বসে চা, কেক্ বিস্কুট খাচ্চি, এটা কি স্বদেশী ব্যাপার? আর সবচেয়ে ভাল যে স্বদেশী গান—ধন ধান্য পুষ্পে ভরা.........তার সুরটী ত শুনতে পাই সম্পূর্ণ বিদেশী।

হি। ওরকম আমাদের সবেতেই একটু আধটু সাহেবিয়ানা ঢুকেচে। এবং ঢোকাও ভাল। এই বাংলা গদ্য যা এত চমৎকার তা কবে থেকে হল?—যবে ইংরেজরা আমাদের রাজা হলেন, আর বাংলা গদ্যলেখকেরা ইংরিজী সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করলেন।

ভু। অবশ্য historically তাই বটে, কিন্তু এখন আর গদ্যে ইংরিজীর নকল করা উচিত নয়। বরং যদি নকল করতে হয় ত ফরাসী গদ্যকেই আদর্শ করা সমীচিন। ইংরিজী prose styleটে একটু ভারী। অধিকন্তু বাংলা ভাষা আর বাঙালী মেজাজের সঙ্গে ফরাসী ভাষা ও ফরাসী মেজাজের যেন বড্ড মিল।

দে। Lord Dyttonও বলেছিলেন,—The Bengalis are the French of Asia। বড় চারটীখানি কথা নয়!

স। কিন্তু ফরাসীদের যে রকম অগ্নিপরীক্ষা চলেচে, ওরা যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না তারই বা ঠিকানা কি?

ভু। তাহলে আধুনিক সভ্যতারও সহমরণ হবে। ইউরোপে সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনকালে গ্রীস্, মধ্যযুগে ইতালী, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স।

স। আর জর্ম্মণি?

ভু। জর্ম্মণি ত এখন আত্মবিস্মৃত। "জ্ঞানাঞ্জনে তার নয়ন আঁধার।" সমগ্র পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত,—তার গর্ব্ব খর্ব্ব করতে উদ্যত।

স। কিন্তু Science ওদের মতন কারও নেই।

ভু। একজন ফরাসী থাকলে জবাব দিত যে ওদের Conscience ও অনন্যসাধারণ।

দে। এখন ওঠা যাক্। আমরা যে রকম omniscient ভাবে কথাবার্ত্তা কইচি তাতে ভুলে গেলে চল্‌বে না যে ঘুমোবার সময় হয়ে এল।

দোলপূর্ণিমা ১৩২৩।

শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব।

তপস্বিনী।

——ঃ॰ঃ——

বৈশাখ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রথম রাত্রে গুমট গেছে, বাঁশ গাছের পাতাটা পর্য্যন্ত নড়ে না, আকাশের তারাগুলো যেন মাথাধরার বেদনার মত দব্‌দব্‌ করিতেছে। রাত্রি তিনটের সময় ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটুখানি বাতাস উঠিল। ষোড়শী শূন্য মেঝের উপর খোলা জানালার নীচে শুইয়া আছে, একটা কাপড়ে মোড়া টিনের বাক্স তার মাথার বালিশ। বেশ বোঝা যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে সে কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছে।

প্রতিদিন ভোর চারটের সময় উঠিয়া স্নান সারিয়া ষোড়শী ঠাকুর-ঘরে গিয়া বসে। আহ্নিক করিতে বেলা হইয়া যায়। তারপরে বিদ্যারত্ন মশায় আসেন; সেই ঘরে বসিয়াই তাঁর কাছে সে গীতা পড়ে। সংস্কৃত সে কিছু কিছু শিখিয়াছে। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য এবং পাতঞ্জলদর্শন মূল গ্রন্থ হইতে পড়িবে এই তার পণ। বয়স তার তেইশ হইবে।

ঘরকরনার কাজ হইতে ষোড়শী অনেকটা তফাৎ থাকে—সেটা যে কেন সম্ভব হইল তার কারণটা লইয়াই এই গল্প! নামের সঙ্গে মাখন বাবুর স্বভাবের কোনো সাদৃশ্য ছিল না। তাঁর মন গলানো বড় শক্ত ছিল। তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যতদিন তাঁর ছেলে বরদা অন্তত বিএ পাশ না করে ততদিন তাঁর বউমার কাছ হইতে সে দূরে থাকিবে। অথচ পড়াশুনাটা বরদার ঠিক ধাতে মেলে না, সে মানুষটি

সৌখীন। জীবন-নিকুঞ্জের মধু সঞ্চয়ের সম্বন্ধে মৌমাছির সঙ্গে তার মেজাজটা মেলে কিন্তু মৌচাকের পালায় যে পরিশ্রমের দরকার সেটা তার একেবারেই সয় না। বড় আশা করিয়াছিল বিবাহের পর হইতে গোঁফে তা দিয়া সে বেশ একটু আরামে থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটগুলো সদরেই ফুঁকিবার সময় আসিবে। কিন্তু কপালক্রমে বিবাহের পরে তার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা তার বাপের মনে আরো বেশী প্রবল হইয়া উঠিল।

ইস্কুলে পণ্ডিত মশায় বরদার নাম দিয়াছিলেন, গোতম মুনি। বলা বাহুল্য সেটা বরদার ব্রহ্মতেজ দেখিয়া নয়। কোনো প্রশ্নের সে জবাব দিত না বলিয়াই তাকে তিনি মুনি বলিতেন এবং যখন জবাব দিত তখন তার মধ্যে এমন কিছু গব্য পদার্থ পাওয়া যাইত যাতে পণ্ডিত মশায়ের মতে তার গোতম উপাধি সার্থক হইয়াছিল।

মাখন হেড মাষ্টারের কাছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, ইস্কুল এবং ঘরের শিক্ষক, এইরূপ বড় বড় দুই এঞ্জিন আগে পিছে জুড়িয়া দিলে তবে বরদার সদ্গতি হইতে পারে। অধম ছেলেদের যাঁরা পরীক্ষা-সাগর তরাইয়া দিয়া থাকেন এমন সব নামজাদা মাষ্টার রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বরদার সঙ্গে লাগিয়া রহিলেন। সত্যযুগে সিদ্ধি-লাভের জন্য বড় বড় তপস্বী যে তপস্যা করিয়াছে সে ছিল একলার তপস্যা—কিন্তু মাষ্টারের সঙ্গে মিলিয়া বরদার এই যে যৌথ তপস্যা এ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃসহ। সেকালের তপস্যার প্রধান উত্তাপ ছিল অগ্নিকে লইয়া; এখনকার এই পরীক্ষা তাপসের তাপের প্রধান কারণ অগ্নিশর্ম্মারা; তারা বরদাকে বড় জ্বালাইল। তাই এত দুঃখের পর যখন সে পরীক্ষায় ফেল করিল তখন তার সান্ত্বনা

হইল এই যে, সে যশস্বী মাষ্টার মশায়দের মাথা হেঁট করিয়াছে। কিন্তু এমন অসামান্য নিষ্ফলতাতেও মাখন বাবু হাল ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় বছরে আর একদল মাষ্টার নিযুক্ত হইল, তাঁদের সঙ্গে রফা হইল এই যে বেতন ত তাঁরা পাইবেনই তারপরে বরদা যদি ফার্ষ্ট ডিবিজনে পাশ করিতে পারে তবে তাঁদের বক্‌শিস্ মিলিবে। এবারেও বরদা যথাসময়ে ফেল করিত, কিন্তু এই আসন্ন দুর্ঘটনাকে একটু বৈচিত্র্য দ্বারা সরস করিবার অভিপ্রায়ে একজামিনের ঠিক আগের রাত্রে পাড়ার কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে একটা কড়া রকমের জোলাপের বড়ি খাইল এবং ধন্বন্তরীর কৃপায় ফেল্ করিবার জন্য তাকে আর সেনেট হল পর্য্যন্ত ছুটিতে হইল না, বাড়ি বসিয়াই সে কাজটা বেশ সুসম্পন্ন হইতে পারিল। রোগটা উচ্চ অঙ্গের সাময়িক পত্রের মত এমনি ঠিক দিনে ঠিক সময়ে প্রকাশ হইল যে, মাখন নিশ্চয় বুঝিল এ কাজটা বিনা সম্পাদকতায় ঘটিতেই পারে না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া তিনি বরদাকে বলিলেন যে তৃতীয় বার পরীক্ষার জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অর্থাৎ তার সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়িয়া গেল।

অভিমানের মাথায় বরদা একদিন খুব ঘটা করিয়া ভাত খাইল না। তাহাতে ফল হইল এই সন্ধ্যাবেলাকার খাবারটা তাকে আরো বেশী করিয়া খাইতে হইল। মাখনকে সে বাঘের মত ভয় করিত তবু মরিয়া হইয়া তাঁকে গিয়া বলিল "এখানে থাক্‌লে আমার পড়াশুনো হবে না।" মাখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেলে সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হতে পারবে?" সে বলিল, "বিলাতে।" মাখন

তাকে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, এ সম্বন্ধে তার যে গোল-টুকু আছে সে ভূগোলে নয়, সে মগজে। স্বপক্ষের প্রমাণস্বরূপে বরদা বলিল, তারই একজন সতীর্থ এণ্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ বেঞ্চিটা হইতে একেবারে এক লাফে বিলাতের একটা বড় একজামিন মারিয়া আনিয়াছে। মাখন বলিলেন বরদাকে বিলাতে পাঠাইতে তাঁর কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার আগে তার বিএ পাস করা চাই।

এও ত বড় মুস্কিল! বিএ পাস না করিয়াও বরদা জন্মিয়াছে, বিএ পাস না করিলেও সে মরিবে, অথচ জন্ম মৃত্যুর মাঝখানটাতে কোথাকার এই বিএ পাস বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, নড়িতে চড়িতে সকল কথায় ঐখানটাতে গিয়াই ঠোকর খাইতে হইবে? কলিকালে অগস্ত্য মুনি করিতেছেন কি? তিনিও কি জটা মুড়াইয়া বিএ পাসে লাগিয়াছেন?

খুব একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বরদা বলিল, বারবার তিন-বার; এইবার কিন্তু শেষ। আর একবার পেন্সিলের দাগ দেওয়া কী-বইগুলা তাকের উপর হইতে পাড়িয়া লইয়া বরদা কোমর বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন সময় একটা আঘাত পাইল সেটা আর তার সহিল না। স্কুলে যাইবার সময় গাড়ির খোঁজ করিতে গিয়া সে খবর পাইল যে, স্কুলে যাইবার গাড়ি ঘোড়াটা মাখন বেচিয়া ফেলিয়া-ছেন। তিনি বলেন, দুই বছর লোকসান গেল, কত আর এই খরচ টানি? স্কুলে হাঁটিয়া যাওয়া বরদার পক্ষে কিছুই শক্ত নয় কিন্তু লোকের কাছে এই অপমানের সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

অবশেষে অনেক চিন্তার পর একদিন ভোরবেলায় তার মাথায়

আসিল, এ সংসারে মৃত্যু ছাড়া আর একটা পথ খোলা আছে যেটা বিএ পাসের অধীন নয়, এবং যেটাতে দারা সুত ধন জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে আর কিছু নয়, সন্ন্যাসী হওয়া। এই চিন্তাটার উপর কিছুদিন ধরিয়া গোপনে সে বিস্তর সিগারেটের ধোঁয়া লাগাইল, তারপর একদিন দেখা গেল স্কুল ঘরের মেঝের উপর তার কী-বইয়ের ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো পরীক্ষা দুর্গের ভগ্নাবশেষের মত ছড়ানো পড়িয়া আছে—পরীক্ষার্থীর দেখা নাই। টেবিলের উপর এক টুক্‌রা কাগজ ভাঙা কাঁচের গেলাস দিয়া চাপা—তাহাতে লেখা "আমি সন্ন্যাসী—আমার আর গাড়ির দরকার হইবে না।

শ্রীযুক্ত বরদানন্দ স্বামী"

মাখন বাবু কিছুদিন কোনো খোঁজই করিলেন না। তিনি ভাবিলেন বরদাকে নিজের গরজেই ফিরিতে হইবে, খাঁচার দরজা খোলা রাখা ছাড়া আর কোনো আয়োজনের দরকার নাই। দরজা খোলাই রহিল, কেবল সেই কী-বইগুলার ছেঁড়া টুক্‌রা সাফ হইয়া গেছে—আর সমস্তই ঠিক আছে। ঘরের কোণে সেই জলের কুঁজার উপরে কানা-ভাঙা গেলাসটা উপুড় করা, তেলের দাগে মলিন চৌকিটার আসনের জায়গায় ছারপোকার উৎপাত ও জীর্ণতার ত্রুটি মোচনের জন্য একটা পুরাতন এটলাসের মলাট পাতা; একধারে একটা শূন্য প্যাকবাক্সের উপর একটা টিনের তোরঙ্গে বরদার নাম আঁকা; দেয়ালের গায়ে তাকের উপর একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি-বাংলা ডিক্সনারি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলা পাতা, এবং মলাটে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখ আঁকা অনেকগুলো এক্সেসাইজ বই। এই খাতা ঝাড়িয়া দেখিলে ইহার অধিকাংশ হইতে অগডেন

কোম্পানির সিগারেটবাক্সবাহিনী বিলাতী নটীদের মূর্ত্তি ঝরিয়া পড়িবে। সন্ন্যাস আশ্রয়ের সময় পথের সান্ত্বনার জন্যে এগুলো যে বরদা সঙ্গে লয় নাই তাহা হইতে বুঝা যাইবে তার মন প্রকৃতিস্থ ছিল না।

আমাদের নায়কের ত এই দশা; নায়িকা ষোড়শী তখন সবেমাত্র ত্রয়োদশী। বাড়িতে শেষ পর্য্যন্ত সবাই তাকে খুকি বলিয়া ডাকিত, শ্বশুর বাড়িতেও সে আপনার এই চিরশৈশবের খ্যাতি লইয়া আসিয়াছিল, এইজন্য তার সামনেই বরদার চরিত্র সমালোচনায় বাড়ির দাসীগুলোর পর্য্যন্ত বাধিত না। শাশুড়ি ছিলেন চিররুগ্না—কর্ত্তার কোনো বিধানের উপরে কোনো কথা বলিবার শক্তি তাঁর ছিল না, এমন কি মনে করিতেও তাঁর ভয় করিত। পিসশাশুড়ির ভাষা ছিল খুব প্রখর, বরদাকে লইয়া তিনি খুব শক্ত শক্ত কথা খুব চোখা চোখা করিয়া বলিতেন। তার বিশেষ একটু কারণ ছিল। পিতামহদের আমল হইতে কৌলীন্যের অপদেবতার কাছে বংশের মেয়েদের বলি দেওয়া এবাড়ির একটা প্রথা। এই পিসি যার ভাগে পড়িয়াছিলেন সে একটা প্রচণ্ড গাঁজাখোর। তার গুণের মধ্যে এই যে সে বেশী দিন বাঁচে নাই। তাই আদর করিয়া ষোড়শীকে তিনি যখন মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করিতেন, তখন অন্তর্যামী বুঝিতেন ব্যর্থ মুক্তাহারের জন্য যে আক্ষেপ সে একা ষোড়শীকে লইয়া নয়।

এ ক্ষেত্রে মুক্তাহারের যে বেদনাবোধ আছে সে কথা সকলে ভুলিয়াছিল। পিসি বলিতেন, দাদা কেন যে এত মাষ্টার পণ্ডিতের পিছনে খরচ করেন তা ত বুঝিনে, লিখে পড়ে দিতে পারি বরদা কখনই পাস করতে পারবে না। পারিবে না এ বিশ্বাস ষোড়শীরও ছিল

কিন্তু সে একমনে কামনা করিত যেন কোনো গতিকে পাস করিয়া বরদা অন্তত পিসির মুখের ঝাঁজটা মারিয়া দেয়। বরদা প্রথম বার ফেল করিবার পর মাখন যখন দ্বিতীয়বার মাষ্টারের ব্যূহ বাঁধিবার চেষ্টায় লাগিলেন—পিসি বলিলেন, "ধন্য বলি দাদাকে! মানুষ ঠেকেও ত শেখে!" তখন ষোড়শী দিনরাত কেবল এই অসম্ভব ভাবনা ভাবিতে লাগিল, বরদা এবার যেন হঠাৎ নিজের আশ্চর্য্য গোপন শক্তি প্রকাশ করিয়া অবিশ্বাসী জগৎটাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়; সে যেন প্রথম শ্রেণীতে সব প্রথমের চেয়েও আরো আরো আরো অনেক বড় হইয়া পাস করে—এত বড়, যে স্বয়ং লাটসাহেব সওয়ার পাঠাইয়া দেখা করিবার জন্য তাহাকে তলব করেন, এমন সময়ে কবিরাজের অব্যর্থ বড়িটা ঠিক পরীক্ষাদিনের মাথার উপর যুদ্ধের বোমার মত আসিয়া পড়িল। সেটাও মন্দের ভালো হই‧ যদি লোকে সন্দেহ না করিত। পিসি বলিলেন, "ছেলের এদিকে বুদ্ধি নেই ওদিকে আছে।" লাট-সাহেবের তলব পড়িল না। ষোড়শী মাথা হেঁট করিয়া লোকের হাসা-হাসি সহ্য করিল। সময়োচিত জোলাপের প্রহসনটায় তার মনেও যে সন্দেহ হয় নাই এমন কথা বলিতে পারি না।

এমন সময় বরদা ফেরার হইল। ষোড়শী বড় আশা করিয়াছিল, অন্তত এই ঘটনাটাকেও বাড়ির লোকে দুর্ঘটনা জ্ঞান করিয়া অনুতাপ পরিতাপ করিবে। কিন্তু তাহাদের সংসার বরদার চলিয়া-যাওটাকেও পূরা দাম দিল না। সবাই বলিল, "এই দেখ না, এল বলে'!" ষোড়শী মনে মনে বলিতে লাগিল, "কখ্‌খনো না! ঠাকুর লোকের কথা মিথ্যা হোক্! বাড়ির লোককে যেন হায় হায় করতে হয়!"

এইবার বিধাতা ষোড়শীকে বর দিলেন—তার কামনা সফল হইল।

এক মাস গেল বরদার দেখা নাই; কিন্তু তবু কারো মুখে কোনো উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় না। দুই মাস গেল তখন মাখনের মনটা একটু চঞ্চল হইয়াছে কিন্তু বাহিরে সেটা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বউমার সঙ্গে চোখোচোখি হইলে তাঁর মুখে যদিবা বিষাদের মেঘসঞ্চার দেখা যায় পিসির মুখ একেবারে জ্যৈষ্ঠমাসের অনাবৃষ্টির আকাশ বলিলেই হয়। কাজেই সদর দরজার কাছে একটা মানুষ দেখিলেই ষোড়শী চমকিয়া ওঠে, আশঙ্কা পাছে তার স্বামী ফিরিয়া আসে। এম্নি করিয়া যখন তৃতীয় মাস কাটিল, তখন, ছেলেটা বাড়ির সকলকে মিথ্যা উদ্বিগ্ন করিতেছে বলিয়া পিসি নালিশ সুরু করিলেন। এও ভালো, অবজ্ঞার চেয়ে রাগ ভালো। পরিবারের মধ্যে ক্রমে ভয় ও দুঃখ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। খোঁজ করিতে করিতে ক্রমে এক বছর যখন কাটিল তখন, মাখন যে বরদার প্রতি অনাবশ্যক কঠোরাচরণ করিয়াছেন সে কথা পিসিও বলিতে সুরু করিলেন। দুই বছর যখন গেল তখন পাড়া প্রতিবেশীরাও বলিতে লাগিল, বরদার পড়াশুনায় মন ছিল না বটে কিন্তু মানুষটি বড় ভালো ছিল। বরদার অদর্শনকাল যতই দীর্ঘ হইল, ততই তার স্বভাব যে অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, এমন কি, সে যে তামাকটা পর্য্যন্ত খাইত না এই অন্ধ বিশ্বাস পাড়ার লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বয়ং বলিলেন, এইজন্যই ত তিনি বরদাকে গোতম মুনি নাম দিয়াছিলেন, তখন হইতেই উহার বুদ্ধি বৈরাগ্যে একেবারে নিরেট হইয়াছিল। পিসি প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া তাঁর দাদার জেদী মেজাজের পরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বরদার এত লেখাপড়ার দরকারই বা কি ছিল? টাকার ত অভাব নাই। যাই বল বাপু, তার শরীরে কিন্তু দোষ ছিল না। আহা সোনার টুক্রো

ছেলে।” তার স্বামী যে পবিত্রতার আদর্শ ছিল এবং সংসারশুদ্ধ সকলেই তার প্রতি অন্যায় করিয়াছে সকল দুঃখের মধ্যে এই সান্ত্বনায়, এই গৌরবে ষোড়শীর মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে বাপের ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া ষোড়শীর উপর আসিয়া পড়িল। বৌমা যাতে সুখে থাকে মাখনের এই একমাত্র ভাবনা। তাঁর বড় ইচ্ছা, ষোড়শী তাঁকে এমন-কিছু ফরমাস্ করে যেটা দুর্লভ—অনেকটা কষ্ট করিয়া লোকসান করিয়া তিনি তাকে একটু খুসি করিতে পারিলে যেন বাঁচেন,—তিনি এমন করিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে চান যেটা তাঁর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের মত হইতে পারে।

(২)

ষোড়শী পনেরো বছরে পড়িল। ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া যখন-তখন তার চোখ জলে ভরিয়া আসে। চিরপরিচিত সংসারটা তাকে চারদিকে যেন আঁটিয়া ধরে, তার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে। তার ঘরের প্রত্যেক জিনিসটা, তার বারান্দার প্রত্যেক রেলিংটা, আলিসার উপর যে কয়টা ফুলের গাছের টব চিরকাল ধরিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে তারা সকলেই যেন অন্তরে অন্তরে তাকে বিরক্ত করিতে থাকিত। পদে পদে ঘরের খাটটা, আলনাটা, আলমারিটা—তার জীবনের শূন্যতাকে বিস্তারিত করিয়া ব্যাখ্যা করে, সমস্ত জিনিসপত্রের উপর তার রাগ হইতে থাকে।

সংসারে তার একমাত্র আরামের জায়গা ছিল ঐ জানালার কাছটা। যে বিশ্বটা তার বাহিরে সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে আপন। কেননা, তার “ঘর হৈলা বাহির, বাহির হৈল ঘর।”

একদিন যখন বেলা দশটা ; অন্তঃপুরে যখন বাটি বারকোস ধামা চুপড়ি শিলনোড়া ও পানের বাক্সের ভিড় জমাইয়া ঘরকরনার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় সংসারের সমস্ত ব্যস্ততা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জানলার কাছে ষোড়শী আপনার উদাস মনকে শূন্য আকাশে দিকে দিকে রওনা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ "জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া হাঁক দিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাদের গেটের কাছের অশথতলা হইতে বাহির হইয়া আসিল। ষোড়শীর সমস্ত দেহতন্তু মীড়টানা বীণার তারের মত চরম ব্যাকুলতায় বাজিয়া উঠিল। সে ছুটিয়া আসিয়া পিসিকে বলিল, পিসিমা, ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগের আয়োজন কর।

এই সুরু হইল। সন্ন্যাসীর সেবা ষোড়শীর জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এতদিন পরে শ্বশুরের কাছে বধূর আব্দারের পথ খুলিয়াছে। মাখন উৎসাহ দেখাইয়া বলিলেন, বাড়িতে বেশ ভালো রকম একটা অতিথিশালা খোলা চাই। মাখন বাবুর কিছুকাল হইতে আয় কমিতেছিল কিন্তু তিনি বারো টাকা সুদে ধার করিয়া সৎকর্ম্মে লাগিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও যথেষ্ট জুটিতে লাগিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ যে খাঁটি নয় মাখনের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বউমার কাছে তার আভাস দিবার জো কি! বিশেষতঃ জটাধারীরা যখন আহার আরামের অপরিহার্য্য ত্রুটি লইয়া গালি দেয়, অভিশাপ দিতে ওঠে, তখন এক-একদিন ইচ্ছা হইত তাদের ঘাড়ে ধরিয়া বিদায় করিতে। কিন্তু ষোড়শীর মুখ চাহিয়া তাহাদের পায়ে ধরিতে হইত। এই ছিল তাঁর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত।

সন্ন্যাসী আসিলেই প্রথমে অন্তঃপুরে একবার তার তলব পড়িত। পিসি তাকে লইয়া বসিতেন, ষোড়শী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিত।

এই সাবধানতার কারণ ছিল এই—পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রথমেই মা বলিয়া ডাকিয়া বসে! কেননা কি জানি!— বরদার যে-ফোটোগ্রাফ খানি ষোড়শীর কাছে ছিল সেটা তার ছেলে বয়সের। সেই বালক-মুখের উপর গোঁফ দাড়ি জটাজূট ছাইভস্ম যোগ করিয়া দিলে সেটার যে কি রকম অভিব্যক্তি হইতে পারে তা বলা শক্ত। কতবার কত মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছে বুঝি কিছু কিছু মেলে; বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বহিয়াছে, তার পরে দেখা যায় কণ্ঠস্বরে ঠিক মিল নাই, নাকের ডগার কাছটা অন্য রকম।

এমনি করিয়া ঘরের কোণে বসিয়াও নূতন নূতন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া ষোড়শী যেন বিশ্বজগতে সন্ধানে বাহির হইয়াছে। এই সন্ধানই তার সুখ। এই সন্ধানই তার স্বামী, তার জীবন যৌবনের পরিপূর্ণতা। এই সন্ধানটিকেই ঘেরিয়া তার সাংসারের সমস্ত আয়োজন। সকালে উঠিয়াই ইহারই জন্য তার সেবার কাজ আরম্ভ হয়,—এর আগে রান্নাঘরের কাজ সে কখনো করে নাই, এখন এই কাজেই তার বিলাস। সমস্তক্ষণই মনের মধ্যে তার প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালানো থাকে। রাতে শুইতে যাইবার আগে, কাল হয়ত আমার সেই অতিথি আসিয়া পৌঁছিবে, এই চিন্তাটিই তার দিনের শেষ চিন্তা। এই যেমন সন্ধান চলিতেছে, অমনি সেই সঙ্গে যেমন করিয়া বিধাতা তিলোত্তমাকে গড়িয়াছিলেন, তেমনি করিয়া ষোড়শী নানা সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিলাইয়া বরদার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। পবিত্র তা'র সত্তা, তেজঃপুঞ্জ তা'র দেহ, গভীর তা'র জ্ঞান, অতিকঠোর তা'র ব্রত। এই সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কার? সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে এই এক সন্ন্যাসীরই ত পূজা চলিতেছে। স্বয়ং তার

শ্বশুরও যে এই পূজার প্রধান পূজারি, ষোড়শীর কাছে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কিছু ছিল না।

কিন্তু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই ত আসে না। সেই ফাঁকগুলো বড় অসহ্য। ক্রমে সে ফাঁকও ভরিল। ষোড়শী ঘরে থাকিয়াই সন্ন্যাসের সাধনায় লাগিয়া গেল। সে মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শোয়, একবেলা যা খায় তার মধ্যে ফল মূলই বেশী। গায়ে তার গেরুয়া রঙের তসর, কিন্তু সাধব্যের লক্ষণ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চওড়া তার লাল পাড়, এবং কল্যাণীর সিঁথির অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া মোটা একটা সিন্দুরের রেখা। ইহার উপরে শ্বশুরকে বলিয়া সংস্কৃত পড়া সুরু করিল। মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিতে তার অধিক দিন লাগিল না—পণ্ডিত মশায় বলিলেন, এ'কেই বলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা।

পবিত্রতায় সে যতই অগ্রসর হইবে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার অন্তরের মিলন ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে এই সে মনে মনে ঠিক করিয়াছিল। বাহিরের লোকে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এই সন্ন্যাসী সাধুর সাধ্বী স্ত্রীর পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইবার লোকের ভিড় বাড়িতে থাকিল,—এমন কি স্বয়ং পিসিও তার কাছে ভয়ে সম্ভ্রমে চুপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ষোড়শী যে নিজের মন জানিত। তার মনের রং ত তার গায়ের তসরের রঙের মত সম্পূর্ণ গেরুয়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। আজ ভোর বেলাটাতে ঐ যে ঝির্ ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছিল সেটা যেন তার সমস্ত দেহ মনের উপর কোন্ একজনের কাণে কাণে কথার মত আসিয়া পৌঁছিল। উঠিতে আর ইচ্ছা করিতেছিল না। জোর করিয়া উঠিল, জোর করিয়া কাজ করিতে গেল। ইচ্ছা করিতে-

ছিল জানালার কাছে বসিয়া, তার মনের দূর দিগন্ত হইতে যে বাঁশির সুর আসিতেছে সেইটে চুপ করিয়া শোনে। এক একদিন তার সমস্ত মন যেন অতিচেতন হইয়া ওঠে; রৌদ্রে নারিকেলের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে সে যেন তার বুকের মধ্যে কথা কহিতে থাকে। পণ্ডিত মশায় গীতা পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন সেটা ব্যর্থ হইয়া যায়, অথচ সেই সময়ে তার জানালার বাহিরের বাগানে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়া যখন কাঠবিড়ালী খস্‌খস্‌ করিয়া গেল, বহুদূর আকাশের হৃদয় ভেদ করিয়া চীলের একটা তীক্ষ্ণ ডাক আসিয়া পৌঁছিল, ক্ষণে ক্ষণে পুকুর পাড়ের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার একটা ক্লান্ত শব্দ বাতাসকে আবিষ্ট করিল এই সমস্তই তার মনকে স্পর্শ করিয়া অকারণে ব্যাকুল করে। এ'কে ত কিছুতেই বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। যে বিস্তীর্ণ জগৎটা তপ্ত প্রাণের জগৎ—পিতামহ ব্রহ্মার রক্তের উত্তাপ হইতেই যার আদিম বাষ্প আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছিল; যা তাঁর চতুর্ম্মুখের বেদবেদান্ত উচ্চারণের অনেক পূর্ব্বের সৃষ্টি, যার রঙের সঙ্গে, ধ্বনির সঙ্গে, গন্ধের সঙ্গে সমস্ত জীবের নাড়ীতে নাড়ীতে বোঝাপড়া হইয়া গেছে তারই ছোটবড় হাজার হাজার দূত জীব-হৃদয়ের খাস মহলে আনাগোনার গোপন পথটা জানে—ষোড়শী ত কৃচ্ছ্র-সাধনের কাঁটা গাড়িয়া আজো সে পথ বন্ধ করিতে পারিল না।

কাজেই গেরুয়া রংকে আরো ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। ষোড়শী পণ্ডিত মশায়কে ধরিয়া পড়িল আমাকে যোগাসনের প্রণালী বলিয়া দিন। পণ্ডিত বলিলেন, "মা, তোমার ত এ' সকল পন্থায় প্রয়োজন নাই। সিদ্ধি ত পাকা আমলকীর মত আপনি তোমার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।" তার পুণ্যপ্রভাব লইয়া চারিদিকে লোকে বিস্ময়

প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাতে ষোড়শীর মনে একটা স্তবের নেশা জমিয়া গেছে। এমন একদিন ছিল বাড়ির ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাকে কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, তাই আজ যখন তাকে পুণ্যবতী বলিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল তখন তার বহুদিনের গৌরবের তৃষ্ণা মিটিবার সুযোগ হইল। সিদ্ধি যে সে পাইয়াছে একথা অস্বীকার করিতে তার মুখে বাধে। তাই পণ্ডিত মশায়ের কাছে সে চুপ করিয়া রহিল।

মাখনের কাছে ষোড়শী আসিয়া বলিল, বাবা, আমি কার কাছে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে শিখি বল ত?

মাখন বলিলেন, সেটা না শিখিলেও ত বিশেষ অসুবিধা দেখি না। তুমি যতদূরে গেছ সেই খানেই তোমার নাগাল ক'জন লোকে পায়?

তা হউক্ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হইবে। এমনি দুর্দ্দৈব যে, মানুষও জুটিয়া গেল। মাখনের বিশ্বাস ছিল আধুনিক কালের অধিকাংশ বাঙালীই মোটামুটি তাঁরই মত—অর্থাৎ খায়দায় ঘুমায়, এবং পরের কুৎসাঘটিত ব্যাপার ছাড়া জগতে আর কোনো অসম্ভবকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, বাংলা দেশে এমন মানুষও আছে যে ব্যক্তি খুলনা জেলায় ভৈরব নদের ধারে খাঁটি নৈমিষারণ্য আবিষ্কার করিয়াছে। এই আবিষ্কারটা যে সত্য তার প্রধান প্রমাণ, ইহা কৃষ্ণপ্রতিপদের ভোর বেলায় স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং সরস্বতী ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি যদি নিজবেশে আসিয়া আবির্ভূত হইতেন তাহা হইলেও বরঞ্চ সন্দেহের কারণ থাকিত—কিন্তু তিনি তাঁর আশ্চর্য্য দেবীলীলায় হাঁড়িচাঁচা পাখী হইয়া দেখা দিলেন। পাখীর ল্যাজে তিনটি মাত্র পালক ছিল; একটি সাদা, একটি সবুজ, মাঝেরটি পাটকিলে;—এই পালক তিনটি যে সত্ত্ব রজ

তম, ঋক্ যজুঃ সাম, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, আজ কাল পর্শু প্রভৃতি যে তিন সংখ্যার ভেল্কী লইয়া এই জগৎ তাহারই নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তার পর হইতে এই নৈমিষারণ্যে যোগী তৈরী হইয়েছে; দুইজন এম্ এস্ সি ক্লাসের ছেলে কলেজ ছাড়িয়া এখানে যোগ অভ্যাস করেন; একজন সাব্ জজ্ তাঁর সমস্ত পেন্সেন্ এই নৈমিষারণ্য ফণ্ডে উৎসর্গ করিয়াছেন, এবং তাঁর পিতৃমাতৃহীন ভাগ্নেটিকে এখানকার যোগী ব্রহ্মচারীদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া মনে আশ্চর্য্য শান্তি পাইয়াছেন।

এই নৈমিষারণ্য হইতে ষোড়শীর জন্য যোগ অভ্যাসের শিক্ষক পাওয়া গেল। সুতরাং মাখনকে নৈমিষারণ্য কমিটির গৃহীসভ্য হইতে হইল। গৃহীসভ্যের কর্ত্তব্য নিজের আয়ের ষষ্ঠ অংশ সন্ন্যাসী সভ্যদের ভরণপোষণের জন্য দান করা। গৃহীসভ্যদের শ্রদ্ধার পরিমাণ অনুসারে এই ষষ্ঠ অংশ, অনেক সময় থার্ম্মমিটরের পারার মত সত্য অঙ্কটার উপরে নীচে ওঠা নামা করে। অংশ কসিবার সময় মাখনেরও ঠিকে ভুল হইতে লাগিল। সেই ভুলটার গতি নীচের অঙ্কের দিকে। কিন্তু এই ভুল-চুকে নৈমিষারণ্যের যে ক্ষতি হইতেছিল ষোড়শী তাহা পূরণ করিয়া দিল। ষোড়শীর গহনা আর বড় কিছু বাকী রহিল না, এবং তার মাসহারার টাকা প্রতিমাসে সেই অন্তর্হিত গহনাগুলোর অনুসরণ করিল।

বাড়ীর ডাক্তার অনাদি আসিয়া মাখনকে কহিলেন, "দাদা, করচ কি? মেয়েটা যে মারা যাবে।"

মাখন উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, "তাই ত, কি করি!" ষোড়শীর কাছে তাঁর আর সাহস নাই। এক সময়ে অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে আসিয়া বলিলেন, "মা, এত অনিয়মে কি তোমার শরীর টিঁকবে?"

ষোড়শী একটুখানি হাসিল, তার মর্ম্মার্থ এই, এমন সকল বৃথা উদ্বেগ সংসারী বিষয়ী লোকেরই যোগ্য বটে।

(৩)

বরদা চলিয়া যাওয়ার পরে বারো বৎসর পার হইয়া গেছে, এখন ষোড়শীর বয়স পঁচিশ। একদিন ষোড়শী তাঁর যোগী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না, তা আমি কেমন করে' জান্‌ব?"

যোগী প্রায় দশ মিনিট কাল স্তব্ধ হইয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন, তার পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "জীবিত আছেন।"

"কেমন করে জান্‌লেন?"

"সে কথা এখনো তুমি বুঝবে না। কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো স্ত্রীলোক হয়েও সাধনার পথে তুমি যে এতদূর অগ্রসর হয়েচ সে কেবল তোমার স্বামীর অসামান্য তপোবলে। তিনি দূরে থেকেও তোমাকে সহধর্ম্মিণী করে নিয়েচেন।"

ষোড়শীর শরীর মন পুলকিত হইয়া উঠিল। নিজের সম্বন্ধে তার মনে হইল, ঠিক যেন শিব তপস্যা করিতেছেন আর পার্ব্বতী পদ্মবীজের মালা জপিতে জপিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

ষোড়শী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন তা' কি জান্‌তে পারি?"

যোগী ঈষৎ হাস্য করিলেন, তার পরে বলিলেন, "একখানা আয়না নিয়ে এস।"

ষোড়শী আয়না আনিয়া যোগীর নির্দ্দেশমত তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আধঘণ্টা গেলে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু দেখতে পাচ্চ?"

ষোড়শী দ্বিধার স্বরে কহিল, "হাঁ, যেন কিছু দেখা যাচ্চে কিন্তু সেটা যে কি তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌চি নে।"

"শাদা কিছু দেখ্‌চ কি?"

"শাদাই ত বটে।"

"যেন পাহাড়ের উপর বরফের মত?"

"নিশ্চয়ই বরফ! কখনো পাহাড় ত দেখি নি তাই এতক্ষণ ঝাপসা ঠেকছিল।"

এইরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল বরদা হিমালয়ের অতি দুর্গম জায়গায় লঙ্‌চু পাহাড়ে বরফের উপর অনাবৃত দেহে বসিয়া আছেন। সেখান হইতে তপস্যার তেজ ষোড়শীকে আসিয়া স্পর্শ করিতেছে, এই এক আশ্চর্য্য কাণ্ড!

সেদিন ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া ষোড়শীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তার স্বামীর তপস্যা যে তাকে দিনরাত ঘেরিয়া আছে, স্বামী কাছে থাকিলে মাঝে মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারিত সে বিচ্ছেদও যে তার নাই, এই আনন্দে তার মন ভরিয়া উঠিল। তার মনে হইল সাধনা আরো অনেক বেশী কঠোর হওয়া চাই। এতদিন এবং পৌষমাসটাতে যে কম্বল সে গায়ে দিতেছিল এখনি সেটা ফেলিয়া দিতেই শীতে তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ষোড়শীর মনে হইল সেই লঙ্‌চু পাহাড়ের হাওয়া তার গায়ে আসিয়া

লাগিতেছে। হাত জোড় করিয়া চোখ বুজিয়া সে বসিয়া রহিল, চোখের কোণ দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল।

সেই দিনই মধ্যাহ্নে আহারের পর মাখন ষোড়শীকে তাঁর ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড়ই সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "মা, এতদিন তোমার কাছে বলি নি, ভেবেছিলুম দরকার হবে না কিন্তু আর চল্‌চে না। আমার সম্পত্তির চেয়ে আমার দেনা অনেক বেড়েচে, কোন্ দিন আমার বিষয় ক্রোক্ করে বলা যায় না।"

ষোড়শীর মুখ আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, এ সমস্তই তার স্বামীর কাজ। তার স্বামী তাকে পূর্ণ-ভাবে আপন সহধর্ম্মিণী করিতেছেন—বিষয়ের যেটুকু ব্যবধান মাঝে ছিল সেও বুঝি এবার ঘুচাইলেন। কেবল উত্তরে হাওয়া নয় এই যে দেনা এও সেই লংচু পাহাড় হইতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, এ তার স্বামীরই দক্ষিণ হাতের স্পর্শ।

সে হাসিমুখে বলিল, "ভয় কি বাবা?"

মাখন বলিলেন, "আমরা দাঁড়াই কোথায়?"

ষোড়শী বলিল, "নৈমিষারণ্যে চালা বেঁধে থাকব।"

মাখন বুঝিলেন ইহার সঙ্গে বিষয়ের আলোচনা বৃথা। তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে মোটর গাড়ি দরজার কাছে আসিয়া থামিল। সাহেবি কাপড় পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারচেন না?"

"একি? বরদা নাকি?"

বরদা জাহাজের লস্কর হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। বারো বৎসর পরে সে আজ কোন এক কাপড়-কাচা কল কম্পানির ভ্রমণ-কারী এজেন্ট হইয়া ফিরিয়াছে। বাপকে বলিল, "আপনার যদি কাপড়-কাঁচা কলের দরকার থাকে খুব সস্তায় করে' দিতে পারি।" বলিয়া ছবি আঁকা ক্যাটলগ্ পকেট হইতে বাহির করিল।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আষাঢ়, ১৩২৪।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৯

কলিকাতা।

৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।

সারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মুখরক্ষা।

——:০:——

ভয়ঙ্কর গোলমাল! সন্ধ্যের পর থেকেই সদর দরজার উপর থেকে সানাইয়ের চীৎকার এবং এঁটোপাতা নিয়ে কুকুরদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপে গুটীকয়েক ভট্চাজ্জি নস্যি নাকে টিপে শাস্ত্রের কচ্‌কচানি জুড়ে দিয়েছেন, এবং বাড়ীর মধ্যে মেয়েরা কুট্‌নো কোটা এবং ছেলেদের দুটো খাইয়ে দেবার তালে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছেন।

বাড়ীর পাশের পোড়ো জমির মেরাপের নীচে একদল বরযাত্রী এসে জড় হয়েছেন যাঁদের তুমুল আনন্দের স্রোত থেকে থেকে অন্য সব শব্দকেই ভাসিয়ে কিম্বা ডুবিয়ে দিচ্ছে।

পাড়ার ভদ্রলোকদের মধ্যে আর বড় কেউ ব্রজেন বাবুর বাড়ীতে আসেন নি, কেবল এসেছেন মুখুজ্জে ও গাঙ্গুলি যাঁরা দুজনেই নিঃসন্তান এবং এই কাজের এবং পাড়ার সকল কাজেরই প্রধান উদ্যোগী। আর এসে জুটেছেন সেই ঘটকচূড়ামণি, যিনি এই সংঘটনের কর্ত্তা, এবং সেই পরামাণিক যে ব্রজেন্দ্র বাবুর বদান্যতার গুণে সব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য ভট্চাজ্জিরা কেউই স্থানীয় নন, সুতরাং বিদায়ের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দায়ের আশঙ্কা তাঁদের ছিল না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই গ্রামস্থ, কিন্তু তাঁদের আসাযাওয়া নাকি সামাজিক হিসাবে ততটা ধর্ত্তব্য নয়, এবং তাঁরা "আসেন নি"

একথা বল্লে পুরুষদের সেটা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন, তাই তাঁদের সংখ্যা সম্ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর গোলমাল ও সংঘর্ষ যদি উৎসবের মানদণ্ড হয় তাহলে এ বিবাহে উৎসবের মাত্রা কিছুই কম হয় নি।

দেখতে দেখতে গ্রামের কতকগুলো ইয়ার ছোক্‌রা এসে বরযাত্র-দের ছেঁকে বেঁকে ধরলে, এবং অবিলম্বেই ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা ও শান্তিভঙ্গের সূত্রপাত হলো ; কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে।

একা ব্রজেন বাবু নিজের সাধ্যমত চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, কাউকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে, কাউকে ভদ্র-কথায় আপ্যায়িত করে, কারুর কাছে বা নির্ব্বাক হয়ে হাত জোড় করে।

বরপাত্র তখনো এসে উপস্থিত হন নি, তাঁর নিহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এখনি আসবেন এই রকম সকলের মুখেই দুই তিন ঘণ্টা ধরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এগারোটার লগ্ন ত প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

তখন আকাশে মেঘ বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাসের দুই একটা দম্‌কা কখনো বা দুই একটা ঝাড়ের আলো নিবিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা আঁস্তাকুড়ের জঞ্জালগুলোকে তুলে নিয়ে ঘুরোতে ঘুরোতে বিয়ের আসরে এনে উপস্থিত কচ্ছে, আর একটা হাড়ীর মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে বকুনি খেয়ে ও সেইগুলোকে পরিষ্কার করে'।

ব্রজেন বাবুর মনটা যেন ক্রমশই কেমন একটু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছে। একে দেখবার লোকের অভাব, তাতে আকাশের বেগতিক, তাতে পাত্রের অনুপস্থিতি, এই তিন কারণে এবং সম্ভবতঃ আরো

অনেক কারণে, যা আমরা জানি না, তাঁর মনের ভিতরকার সমস্ত আয়োজন ও বন্দোবস্তও কে যেন গুলিয়ে দিচ্ছিল। তিনি বাইরে ছুটে গিয়ে একবার ঘড়ির দিকে ভ্রুকুটীর সঙ্গে চেয়ে বল্লেন "তাই ত"। তারপর গাঙ্গুলির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। গাঙ্গুলির কানে কানে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বলবার পর গাঙ্গুলি একটু বিরক্তির স্বরে বলে উঠ্‌লো, "অত অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কেন।"

গাঙ্গুলির কথা শুনে মুখুজ্জে একটা ডাবা হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং ব্রজেন বাবুকে সহসা গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে বল্লেন "তুমি কিচ্ছু ভেবনা ব্রজেন, আমরা যখন রইছি তখন কারুর সাধ্যি নেই যে তোমার কোন রকম অসুবিধে করে—আজই কি, দুদিন পরেই কি।"

আসল কথা, মুখুজ্জে এবং গাঙ্গুলির যে উৎসাহ সে কেবল কর্ম্মের উৎসাহ, তার ফল সম্বন্ধে তাঁদের মত গীতার সঙ্গে যতটা মেলে ব্রজেনের সঙ্গে ততটা নয়।

ঘটক পীতাম্বর তখন তর্কবাগীশের সঙ্গে স্মৃতিতীর্থের রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিয়ে যে তর্ক হচ্ছিল—তাই হাঁ করে' গিলে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে খট্ করে বাজলো মুখুজ্জের শেষ কথা। পাছে এই শেষ মুহূর্ত্তেও সব কেঁচে যায় এই আশঙ্কায় তিনি তাড়াতাড়ি খড়ম পায়ে দিয়ে এবং কাছাটীকে ধূলোয় লুটোতে লুটোতে একেবারে ব্রজেন বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে ভাঙ্গা গলায় বল্লেন—"কেন, কিছু গোলযোগ হচ্ছে নাকি?"

ব্রজেন বাবু ধীর ভাবে "না" এই উত্তর দিয়ে নিকটস্থ সম্প্রদান-স্থলে উপস্থিত হলেন।

পুরোহিত রামধন ভট্টাচার্য্য তখন কুশাসনের উপর দুই হাত দিয়ে দুই জানুকে বেষ্টন করে অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মত উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাম্রকুণ্ডের উপরস্থ এমন কোন জিনিসের উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছিলেন যা ফুল চন্দন নয়।

ব্রজেন বাবুকে দেখেই তিনি দু' তিনটি তুড়ীর সাহায্যে নিজের আলস্য প্রকাশ কল্লেন এবং তাঁর দীর্ঘ চিক্কণ টিকিটীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জণীর মধ্যে পাকাতে পাকাতে বল্লেন "কদ্দূর ব্রজেন বাবু? এদিকে আমার ত সব প্রস্তুত"।

"দেখা যাক্" বলে ব্রজেন বাবু আকাশের দিকে চাইলেন। একটা বিদ্যুত বড় মাছের মত আকাশের গায়ে 'কড়াৎ' করে একটা ঘাই দিয়ে মেঘের রং আরো ঘুলিয়ে দিয়ে গেল।

গাঙ্গুলী, মুখুজ্জে ও ঘটক আস্তে আস্তে ব্রজেন বাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং অধ্যাপকের দল সভাস্থ হলেন। স্মৃতিতীর্থ একটা কোন কথা-প্রসঙ্গ তোল্‌বার ইচ্ছায় বল্লেন—"এ মেঘে বৃষ্টি হবে না—যদিও আড়ম্বর নিতান্ত কম নয়"।

শিরোমণি তাতে সায় দিয়ে বল্লেন—"শরৎকালে সবই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"—ব্রজেন বাবু চমকিত হয়ে শিরোমণির মুখের দিকে চাইলেন।

তর্কবাগীশ শিরোমণিকে তিরস্কারচ্ছলে বল্লেন—"ও কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক, সম্প্রতি লক্ষ্য করা উচিত যাতে লগ্ন ভ্রষ্ট না হয়"।

পুরোহিত সশব্যস্তে উত্তর কল্লেন, "সে বিষয়ে আমি সতর্ক আছি; এখনো রাত্রি দ্বাদশ দণ্ডের অধিক হয় নি—সুতরাং অনুমান আরো অর্দ্ধঘণ্টা সময় আছে"।

"তা হলে আর ত দেরী করা যায় না" বলে' ব্রজেন বাবু নবীন ও বাঙ্গাকে ডেকে বল্লেন "ওরে! লণ্ঠন নিয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে দে, তাঁরা আস্‌ছেন কি না"।

মুখুজ্জে গাঙ্গুলির দিকে চেয়ে বল্লেন "এ উত্তম প্রস্তাবই করেছেন—দেখা দরকার"।

গাঙ্গুলি একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে নবীনকে ডেকে বল্লেন—"আর তাঁদের দেখা পেলে বাঙ্গাকে বলিস তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌তে, আর তুই দৌড়ে এসে আমাদের খবর দিবি"।

স্মৃতিতীর্থ হেসে বল্লেন "এটা খুব প্রবীণ কথা, কারণ তাহলে সংবাদ পাবামাত্রই কার্য্যারম্ভ করা যাবে"। বেশ বোঝা যাচ্চে এই অনুষ্ঠানে যে কয়জনে যোগ দিয়েচেন, সখের যাত্রার দর্শকদের মত অভিনয় ব্যাপারে তাঁদের মন নির্লিপ্ত,—আর কিছু না হোক্ তাঁরা আশা করচেন যথেষ্ট সঙ্ বাহির হবে। এমন সময় বাইরের থেকে শব্দ উঠ্‌লো "ওহে ছোকরা, দেখ না আমাদের দক্ষিণ হস্তের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে কি না—ক্ষিদে মাত্ হয়ে যে চোঁয়া ধোঁ ছাড়্‌তে আরম্ভ কল্লে"।

ব্রজেন বাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে গাঙ্গুলির দিকে চাইলেন। গাঙ্গুলি মুখুজ্জের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বল্লেন—"যাও না হে, একটু থামিয়ে রাখ না—আমি যে এখান ছেড়ে যেতে পাচ্ছি নি"।

একজন রসুইকর ব্রাহ্মণ ছুটে এসে পীতাম্বর ঘটকের কানে কানে বল্লে "বাবু লুচি কি এখন ভাজা বন্ধ থাক্‌বে?"

গাঙ্গুলি ঘটককে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজে দাঁড়িয়ে বল্লেন—“কি ? হয়েছে কি ?”

ব্রজেন বাবু সব শুন্‌তে পেয়েছিলেন, তিনি বল্লেন “দু’চার খানা করে’ ভাজগে”—

গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি বল্লেন—“না,—এক খানাও না—সকলে এসে গেলে, একেবারে পাতে বসিয়ে দিয়ে গরম গরম লুচি পাতে দেবো”।

এদিকে বাড়ীর ভিতর থেকে কে একটা ছেলে উচ্চৈঃস্বরে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো “মা খাঁদী আমার কাপড়ে পাস্তোয়ার রস দিলে।” সঙ্গে সঙ্গে তীব্র-মধুর কণ্ঠে আওয়াজ হলো—“লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে এলে হতো—যা, দূর হ’ ”—অমনি শোনা গেল একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাতের শব্দ, এবং দেখা গেল একটা ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এবং জামা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল এবং উঠোনের মাঝখানে চিৎপাত হয়ে শুয়ে অনন্ত আকাশের বুকে সজোরে লাথি ছুড়্‌তে লাগ্‌লো।

ব্রজেন বাবু তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং গাঙ্গুলীর দিকে চেয়ে বল্লেন “দাদা একবার ভাঁড়ারে না গেলে ত হয় না,—সেখানে নাকি সব লুট হয়ে গেল”।

গাঙ্গুলি খুব মুরুব্বিয়ানা ভাবে বল্লেন “আচ্ছা সে আমি দেখ্‌ছি, তুমি কিছু ভেবো না—আর একলা আমি ক’দিকেই বা যাই”।

গাঙ্গুলি বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে একটা চাকরকে দেখ্‌তে পেয়ে তর্জ্জন করে বলে উঠ্‌লেন “এই বেটা—কোথায় থাকিস্—এক কল্কে তামাক দে”—এই বলে রোয়াকের উপর বসে পড়্‌লেন।

তর্কবাগীশ ব্রজেন বাবুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ খুঁজছিলেন—তিনি আবার কথা পাড়্লেন—"যাই বল শিরোমণি ব্রজেন বাবুর এ কাজ সকলে হয়ত সমর্থন না করতে পারেন, কিন্তু ওঁর সৎসাহসকে প্রশংসা না করবেন এমন কেউই নেই"।

ব্রজেন বাবু তর্কবাগীশের দিকে একটু প্রখরভাবে দৃষ্টিপাত কল্লেন। শিরোমণি বল্লেন "আর এ কাজ ত শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রে এরও ত একটা ব্যবস্থা আছে"।

পুরোহিত মহাশয় স্মৃতিতীর্থের কাছ থেকে একটু নস্যি নিয়েছিলেন—তার ফলে তিনি হাঁচ্তে হাঁচ্তে এবং গামছা দিয়ে নাক রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে বল্লেন—"আঁছে না? নৈলে বিদ্যাসাগর মশায় ত একটা মূর্খ ছিলেন না"।

ক্রমে স্মৃতিতীর্থ ও এ তর্কে যোগদান কল্লেন এবং পরাশর বড় কি মনু বড়, যুগধর্ম্ম মেনে চলা উচিত কি না, এবং "নষ্টে মৃতে"—প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ ও বচনের প্রয়োগে সে স্থান একটা টোলের মতই প্রতীয়মান হতে লাগ্লো।

পীতাম্বর বাঁকা হাসিতে শাণ দিয়ে কেবল এইমাত্র বলে নিরস্ত হলেন "বিশেষতঃ এমন সুপাত্র পেলে সকল বয়সের বিধবাই দার-পরিগ্রহ করতে পারেন।"

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—"শুনে যাও।"

ঘটক চুপ করতে গিয়েও তার মুখ দিয়ে কেবল এই কথাটী বেরিয়ে গেল—"একেবারে কার্ত্তিক—কোন দোষ নেই"।

ব্রজেন বাবু আর সেখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পাল্লেন না ; একজন সানাইওয়ালা এসে বল্লে—"বাবু আমাদের কিছু খাবার মিলবে না ?"

ব্রজেন বাবু "ওরে—ও—হাঁ—চল—আমিই দিচ্ছি" বলে ভাঁড়ারের দিকে ছুট্‌লেন।

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত হেঁকে বল্লেন—"কিন্তু আর ত দেরী করা যায় না—লগ্ন ত এসে গিয়েছে বটেই, বোধ হয় আর কিছুক্ষণ পরেই উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।"

ব্রজেন বাবু ভাঁড়ার থেকে সেই কথা শুনতে পেয়ে ছুটে বাইরে এসে বল্লেন—"ঘড়িতে এখন ত বারটা বাজে—তিন মিনিট আছে।"

স্মৃতিতীর্থ তাড়াতাড়ি পাঁজি টেনে নিয়ে মুখের ভঙ্গীতে নানাবিধ তর্ক ও গণনার চিহ্ন প্রকাশ করে বল্লেন "তাহলে আর ঠিক ১৭ মিনিট আছে, এদিকে তিন ওদিকে চোদ্দ।"

ব্রজেন বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওরে নব্‌নে, ওরে বাঞ্ছা"—তার পর মুখুজ্জেকে আস্‌তে দেখে বল্লেন "মুখুজ্জে পাত্র এসে গিয়েছে ত ?"

মুখুজ্জে কি বল্‌বেন বুঝতে না পেরে বল্লেন—"হাঁ, বোধ হয় এসে গিয়েছে—আমার যেন দূর থেকে সেই রকম মনে হলো।"

"আহা, দেখেই এস না" এই কথা ব্রজেন বাবু বল্‌তেই মুখুজ্জে বল্লেন "দেখে আর আসব কি—বাবাজীকে তুলেই নিয়ে আস্‌ছি"—তারপর তিনি বাইরের দিকে চলে গেলেন।

রামধন ব্রজেন বাবুর দিকে চেয়ে বল্লেন—"ব্রজেন বাবু—শুনছেন—মশায়—এই দিকে আসুন—বসে যান—আপনার কাপড় ত ছাড়াই আছে—আর আপনিই ত সম্প্রদান করবেন ?"

ব্রজেন বাবু “এঁ্যা, আমি বস্‌ব?—তা—আচ্ছা—দাঁড়ান—একটু আস্‌ছি”—বলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ছুট্‌লেন।

“এখন আবার চল্লেন—শীগ্‌গীর আস্‌বেন কিন্তু” বলে’ পুরোহিত ফুলটুল সাজিয়ে নিয়ে আচমন করে বস্‌লেন।

ব্রজেন বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর ভিতর ছুটে গিয়ে ডেকে বেড়াতে লাগ্‌লেন—“গিন্নী—কোথায় গো—গিন্নী”। কিন্তু গিন্নী তখন নিকটে ছিলেন না। ব্রজেন বাবু খুঁজতে গিয়ে বারবার অপরিচিত স্ত্রীলোকদের সুমুখে পড়ে গিয়ে নিজেকে লজ্জিত এবং বিপন্ন বোধ কর্‌তে লাগলেন।

আসল কথা, গিন্নী সেদিন তাঁর শোবার ঘরেই চুপ করে বসে-ছিলেন। আজ ক’দিন ধরে’ চোখের জল পড়ে পড়ে তাঁর চোখদুটো শুক্‌নো কাগজের মত কড়কড়ে হয়ে গিয়েছে—কিন্তু তাহ্‌লেও তাঁর মুখখানা বড়ই ভার--হাসির লেশমাত্র নেই। তবু পাছে এক ফোঁটা জল কোন ভুলে, কোন সময় চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়ে তাই তিনি কোন আমোদ প্রমোদে, কোন আদর সম্ভাষণে যোগদান করেন নি—কেন না কর্ত্তার কড়া হুকুম ছিল—“আগে যা করেছ করেছ, আজকের দিনে চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করতে পারবে না।” পাড়ার দু’একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে তাঁকে প্রফুল্ল করে নিজেদের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। পাড়ার কর্ত্রী বিশেশ্বরী এসে এমন কি তাঁর হাতে ধরে বলেছিলেন “সুবদনীর আবার সীঁথেয় সিঁদুর, হাতে লোহা উঠ্‌বে—আর তুমি মা হয়ে তা দেখবে না”—

জয়ন্তী কিন্তু কেবল এই উত্তর দিয়েছিলেন “তোমরাও ত ওর

মার মত—তোমরা গেলেই হবে—যেদিন ওর সিঁদূর পুঁছে—নোঁয়া ভেঙ্গে—ওকে থান কাপড় পরিয়ে দিয়েছিলুম আমার চোখে আজও ঠিক্ তেমনি একটা দিন।”

ব্রজেন বাবু গিন্নীকে খুঁজছিলেন মেয়ে কোথায় তাই জানবার জন্যে—কিন্তু তিনি হটাৎ নিজেই সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন! তখন তরুণীরা সকলে মিলে সুবদনীকে সাজাচ্ছিল—

তিনি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়তেই সকলে “ওমা কে ও!” বলে ঘোম্‌টা টেনে এক কোণে সরে দাঁড়াল তারপর চিন্তে পেরে ভাবলে তিনি এখনই চলে যাবেন। কিন্তু ব্রজেন বাবু নিশ্চল দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন যেন সে গ্রীক্-পুরাণের সেই একটা পরী যার দিকে চাইলেই লোকে পাথর হয়ে যেত।

তখন মেয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে, চুল বেঁধে তাকে রাঙ্গা সাড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—কেবল কপালে চন্দনের ফুল কিছু বাকি আছে।”

মেয়ে বাপের দিকে একবার চেয়ে ঘাড় নীচু কল্লে—আর তোলবার শক্তি রইলো না—ব্রজেন বাবু দেখতে পেলেন না—সে চোখে তখন বিদ্যুৎ কি বৃষ্টি—কুয়াসা কি ঝড়।

অন্যান্য রমণীরা পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রজেন বাবুর হটাৎ মনে পড়ে গেল কি জন্যে তিনি এসেছেন—কিন্তু কথা কোথায়! ভাষা কোথায়! তিনি কি সব ভুলে গিয়েছেন? তাঁর মাথায় কি আর মস্তিষ্ক এক বিন্দুও নেই? তাঁর বুকের ভিতর কি আর বায়ু চলাচল কর্‌ছে না? না তাঁর জিভ্ শুকিয়ে তালুর সঙ্গে এঁটে গিয়েছে? কিন্তু কথা বল্‌ছিল তাঁর চোখ—সেই চোখ বারবার

মনকে জিজ্ঞাসা করছিল—"কেমন, এই ভাল, না সেই ভাল ? কোন্‌টা ভাল দেখাচ্ছে ? কোন্‌টা দেখে তুমি চিরদিন সুখী থাক্‌বে ?"

ব্রজেন বাবু তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন দেখে সুবদনী আস্তে আস্তে ডাকলে—"বাবা"।

ব্রজেন বাবুর মুখের ভিতর থেকে কি যেন একটা মস্ত পাথর সরে গেল—তিনি কাঁপানো গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"মা, সব ঠিক্—এইবার, এখনো বল, ফিরব না এগোব—একটু পরে আর হাত থাক্‌বে না।"

মেয়ে সে সময় আর কি বল্‌বে—সে জানে তার মায়ের কি স্নেহ—বাপের কি মঙ্গলকামনা। সে জানে তাঁদের একজনের কি ইচ্ছা—আর একজনের কি সংকল্প। এর মধ্যে তার নিজের ক্ষুদ্র সত্তাটুকু কোথায় ? তাকে ছিঁড়ে ভাগ করে দিতে পারলে সে হয়ত দুজন-কেই সন্তুষ্ট করতে পারত, কিন্তু তা সে পার্‌লে কৈ ? তার নিজের মনকে যাচাই করে, বুদ্ধিকে স্থিরভাবে প্রশ্ন করে—তার স্বাভাবিক সংস্কারের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া করিয়ে দেবার সময় পেলে কৈ ? সে কেবল দুই ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজে বিক্ষুব্ধ হয়ে চিন্তিত হয়ে, চূর্ণ হয়ে, মাটির মধ্যে মিশে গিয়েছে—স্বাধীনতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অবসর পায় নি। সে অনেক ভেবে শেষে এই কথাটী বল্লে "বাবা, ভেবনা—ভগবান সকলের মুখরক্ষা কর্‌বেন।"

ব্রজেন বাবু কি বুঝলেন জানি না—দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং একেবারে সম্প্রদাতার আসনের উপর বসে বল্লেন—"কৈ মুখুজ্জে কোথায় ? পাত্রকে এখনো নিয়ে এল না ?"

কিন্তু কোথায় মুখুজ্জে ? নবীন বাঙ্গারও কোন সংবাদ নেই।

এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি নেবে এল—বরযাত্রিরা মেরাপের নীচে থেকে একেবারে হুড়্মুড়্ করে বেরিয়ে এবং অনেক জিনিস পত্র লণ্ডভণ্ড করে পূজার দালানে অর্থাৎ সম্প্রদানের স্থানে গিয়ে হাজির হল।

তাদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা বল্লে "কৈ, না—স্বরূপচন্দ্র ত এখনো এসে পৌঁছয় নি—সে নৌকায় চড়্বে দেখে আমরা চলে এলুম।"

"বল কি!" বলে ব্রজেন বাবু লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

"ব্যস্ত হয়োনা" বলে গাঙ্গুলি তাকে টেনে ধরে বসালেন।

"কিন্তু আর যে লগ্ন নেই" বলে ব্রজেন বাবু গাঙ্গুলির দিকে ঘৃণাপূর্ণ কাতর কটাক্ষে চাইলেন—সে কটাক্ষে সম্মানের চিহ্ন ত ছিলই না বরং বিদ্রোহের ভাব ছিল।

অল্পভাষী, দ্বিধাপূর্ণ ব্রজেন্দ্রের ভিতর যে এতটা শক্তি ও তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল—যাতে সে তাঁর সঙ্গেও কড়া ভাবে কথা বল্‌তে পারে—এটা গাঙ্গুলি আজ নূতন দেখলেন।

তিনি পূর্ব্বের মত একটা যা তা উত্তর দিতে আর সাহস কল্লেন না—"তাহলে যা ভাল হয় তাই কর" বলে দূরে সরে গেলেন।

ঠিক্ সেই সময় সেখানে উপস্থিত হল একটা বিকট বীভৎস মূর্ত্তি—অনেকটা প্রেতের মত; সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা—চক্ষু রক্তবর্ণ—লম্বা চুল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে।

ব্রজেন বাবু তার দিকে চেয়েই বল্লেন—"এ কে? 'কে তুমি?"

সে প্রথমটা চুপ করেই রইল—কোন উত্তর দিতে পাল্লে না—কিন্তু তার চোখ যেন কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় পরামাণিকচন্দ্র এসে তার মাথায় টোপর পরিয়ে দিলে এবং ঘটকরাজও ছুটে এসে বল্লেন "তাই ত এমন অবস্থা"। তারপর অন্দরের দিকে মুখ করে উঁচু গলায় বল্লেন "হুলু দাও—শাঁখ বাজাও।"

অমনি হুলুধ্বনি ও শঙ্খ বেজে উঠল। কিন্তু ব্রজেন বাবু আস্তে আস্তে উঠে ঘটককে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এই কি আমাদের জামাই?"

ঘটক দ্বিধাপূর্ণ ভাবে বল্লেন "তাই বলেই ত মনে হচ্ছে—তবে মুখে টুখে কাদা রয়েছে বলে—"

"কিন্তু আমার ত মনে বল্‌ছে না, এই আমার সুবদনীর বর" বলে' ব্রজেন বাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

"সে সন্দেহ আমারই যখন ভাল করে যায় নি, তখন আপনার ত হতেই পারে—তবে কাদাটাদাগুলো ধুয়ে ফেল্লেই বুঝতে পারবেন" এই বলে ঘটক চাকরদের ডেকে বল্লেন "ওরে জল নিয়ে আয়"—তারপর আগন্তুকের হাত ধরে তাকে বল্লেন "বাবাজি এইদিকে এস—কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে বুঝি? তা পথ যে পিছল—"

এইবার আগন্তুকের মুখে কথা ফুট্‌লো। সে সকলের মুখের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "বর এয়েছে? হাঁ মশায় বর এয়েছে?"

ঘটক বল্লেন, "সে কি কথা বাবাজি, বর ত তুমিই।" সে জড়িতকণ্ঠে বল্লে, "সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। এখনো কি ডুবে ডুবে মরে নি? ঝড়ে নৌকাটা গেল উল্টে, বরের গলার মালাটা গেল ভেসে, আর ঐ আবাগের বেটা বরটাই বাঁচল না কি?"

ঘটক বরের এই প্রলাপ-উক্তি চাপা দিয়ে বলে উঠলেন—"তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক্, সময় বয়ে যায়।"

পীতাম্বরের মুখ কৌতুকহাস্যে কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ব্রজেন এতক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে চৌকির উপরে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন, হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্লেন, "মরেছে, মরেছে, বর মরেছে—চুকে গেছে।"

ঘটক বল্লেন, "কি বল্‌ছেন ব্রজেন বাবু ; আপনার হল কি ?" ব্রজেন বল্লেন, "আমার মুখরক্ষা হল, আমার মেয়ের কথাই খাট্‌ল। এই যদি আমার সুবদনীর বর হয় তা হলে বর মরেছে।"

বাড়ীর ভিতর একটা কান্নার রোল উঠে পড়্‌ল। মুখুজ্জে বেগতিক বুঝে কি একটা হাঁড়ি নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং স্মৃতিতীর্থ, তর্কবাগীশের কানে কানে বল্লেন—"ছানার পায়েস জিনিসটা শোনাই গিয়েছিল, দেখা আর হল না"।

পুরোহিত মহাশয় ব্রজেন বাবুর নিকটে এসে বল্লেন "তা হলে আজ আমি আসি—আপনি দুঃখিত হবেন না—সমস্তই দৈবাধীন কার্য্য—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—তবে আপনি বুদ্ধিমান, বিবেচক লোক—আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব—আমার আজ্‌কের পারিশ্রমিকটা—"

ওদিকে গাঙ্গুলি ও ঘটক দু'পাশ থেকে দু'জনে এসে ব্রজেন বাবুর পাশে দাঁড়ালেন।

গাঙ্গুলি তাঁর মুখখানাকে যথাসম্ভব লম্বা ও বিমর্ষ করে বল্লেন—"ভেবে অবিশ্যি কোন ফল নেই ব্রজেন—তবে ঈশ্বর যা করেন তা ভালর জন্যেই—আমার সন্ধানে খুব ভাল একটী পাত্র আছে এবং খুব সম্ভবতঃ সে রাজী হবে—আমি কালই গিয়ে—"

ব্রজেন বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, সে পরে হবে'।

"না—না—সে পরে কেন—আমি কালই গিয়ে প্রস্তাব তুল্‌ব—তুমি কোন দুঃখ করোনা—এ পাত্রের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ—তার কোন রকম নেশা কি বদ্‌খেয়াল নেই"।

"তা হলে এর ছিল" ? বলে ব্রজেন বাবু এমন একটা ছোট হাসি হাস্‌লেন যা শুন্‌তে খুব বিকট এবং দেখ্‌তে অনেকটা মেঘলা দিনের রোদের মত।

ঘটক তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—"না, না সে রকম কিছু নয়—তবে একটু আধটু—আচ্ছা তা গাঙ্গুলি যার কথা বল্লেন তাকেই না হয় কাল গিয়ে দেখে আসা যাবে—ভালর চেয়েও ত ভাল থেকে থাকে"।

ব্রজেন বাবু ঘটকের দিকে চেয়ে আর একবার হেসে বল্লেন—"বটে ! তা হলে ঈশ্বর না করুন এ পাত্রের ও যদি কিছু হয় তা হলে এর চেয়েও একটা ভাল পাওয়া যাবে ?"

ব্রজেন বাবুর কথার ভাবে গাঙ্গুলি ঘটক সকলেই চুপ কর্‌লেন। বরযাত্রেরা এক এক করে সরে পড়্‌বার উপক্রম করতে লাগল।

ওদিকে এক এক করে কে যেন সব আলো নিবিয়ে দিয়েছে—আর সানাইয়ের সুরও কোন্ সময় বন্ধ হয়ে গেছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত বাড়ী নীরব নিঝুম হয়ে পড়লো।

ব্রজেন বাবু অনেক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে থেকে হটাৎ বলে উঠ্‌লেন—"ওরে কে আছিস্ সব আলো জ্বেলে দে—আর সানাই-ওয়ালাদের বল্ খুব কসে' বাজাতে"।

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"সে কি !—"

ব্রজেন বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বরযাত্র, পুরোহিত এবং অন্যান্য ভদ্র-লোকদের দিকে চেয়ে বল্লেন "আপনারা কেউ যাবেন না—খেতে বসুন—আমি নিজে পরিবেশন কচ্ছি।"

পুরোহিত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন,—"সে কি ব্রজেন বাবু, লগ্ন ত আজ গেছে।"

ব্রজেন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌লেন, "গেছে, গেছে, চিরদিনের মত গেছে, আর ভাবনা নেই।"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

সংস্কৃতের প্রভাব ও অনুবাদ সাহিত্য।

——:o:——
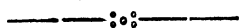
তত্ত্ববিদ্‌গণ সংস্কৃতকে দেবভাষা বলিয়া থাকেন। স্বর্গরাজ্যের নথিপত্র এই ভাষায় রাখা হইত কিনা বলিতে পারি না, তবে ভারতের ভূদেবেরা যে ইহার সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রায়টুকু বলিলাম, কেননা ইহার পূর্ণ দেবত্বের দাবিদারগণ বাদান্তরও পোষণ করিতে পারেন। স্রষ্টার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তিতে যাঁহারা সম্যক বিশ্বাসবান্, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যাঁহাদের নিকট অতি দুর্ব্বোধ্য সুতরাং অকিঞ্চিৎকর, বিচার তর্ক সমাকুল রূপক অপেক্ষা আস্ত রূপেরই যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারা যে এই ভাষার সৃষ্টিমূলে একটা অলৌকিকত্ব আরোপ না করিয়া ছাড়িবেন এরূপ আশা করাই অসঙ্গত।

(২)

না ছাড়ুন, কিন্তু বর্ত্তমানে দ্যুলোক ও ভূলোকের সম্বন্ধটা পূর্ব্বাপেক্ষা যেন বেশী তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। কলির দুর্দ্দান্ত বিজ্ঞানাসুর উভয় রাজ্যের সংযোজক বার্ত্তাবহের তার কাটিয়াছে, লৌহবর্ত্ম ভাঙ্গিয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতুসকল ডিনেমাইটে উড়াইয়াছে।

ভাগীরথীর মত এই দেবভাষার ধারাটাও কি অমরা হইতেই নামিয়া আসিয়াছে? শাস্ত্রজ্ঞেরা বোধ হয় এরূপই একটা সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যে আবার অন্য রকম ব্যাখ্যা ঝাড়িবেন। তিনি বলিবেন স্বর্গ হইতে তোমার দেবভাষার অবতরণটা আকাশ থেকে ঝুপ করিয়া তোমার ভাগীরথী পড়ার মতই সত্য! আমরা সংস্কৃতকে কেন দেবভাষা বলি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে কোমর বাঁধিয়া বসি নাই। এই দৈব উৎপত্তি সম্বন্ধে যতটুকু বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। নিজ জন্মভূমির উপর সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করাই এই প্রসঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য। লাটিন, গ্রীক, মৈসরিক, চৈনিক প্রভৃতি সকল পুরা সাহিত্যেরই নিজ নিজ দেশের উপর বর্ত্তমানেও কিছু না কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সংস্কৃতের যতটা, বোধ হয় এই ধরাধামে ততটা কাহারই নাই।

(৩)

সম্পূর্ণ ভাষাটার কথা দূরে থাকুক, ইহার একটা বিন্দুর মধ্যে যে প্রতাপ নিহিত আছে, তাহার কাছে বুঝি প্রলয়ঙ্করী তড়িতশক্তিও হার মানে। বাস্তবিক বিসর্গের বিন্দুদুটীর মধ্যে যে সপ্তসিন্ধুর বল লুক্কায়িত! বিচার বল, তর্ক বল, জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, কত সময়ে সবই যে ঐ ক্ষুদ্র বিন্দুনিঃসৃত শক্তির প্রবাহে কোথায় একেবারে ভাসিয়া যায়। কত ঐরাবতি পাণ্ডিত্য, কত অভ্রভেদী মহত্ত্ব, কত পগম্বরের সদুক্তি, কত চার্ব্বাকের বদ্‌উক্তি এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের চরণমূলে লুটাপুটি খাইয়াছে! ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলুন এমন যাদুশক্তি কি তিনি আর কোন ভাষায় দেখিয়াছেন? তাঁহার লাটিন, গ্রীক,

হিব্রুতে ঐ অনুস্বর বিসর্গের খোঁচার মত এমনটি কি কিছু আছে? যাহা এত ছোট, অনেক সময় দেখিতে গেলে অনুবীক্ষণ লাগাইতে হয়, অথচ যাহার তাড়নে হিমগিরি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, যাহাকে লিখিতে কিছুমাত্র আয়াস নাই—কলমের এক আঁচড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় বাহির হইয়া পড়ে অথচ যাহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া হাজার হাজার পণ্ডিতের মাথা ঘুলাইয়া দিয়া আসিয়াছে—জানি না ইহার তুলনা কোথাও আছে কিনা!

(৪)

ভাল, এই প্রভাবটার কি কিছু মুল নাই? ইহা কি নিতান্ত অহেতুক, না কেবলমাত্র অতীতের প্রতি অন্ধভক্তিজনিত? অতীত ত সকল জাতিরই আছে। এবং অতীতের প্রতি ভক্তির নিদর্শন অল্পাধিক সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। তবে ভারতে ইহার এতটা আতিশয্য হইয়া পড়িল কেন? অনেকে বলিবেন, ভারতে চিরদিন ইহার আতিশয্য ছিল না। ভারতের যখন জীবন ছিল, তখন ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইত। ধর্ম্ম তখন কর্ম্মকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিত না। কর্ম্মও ধর্ম্মকে একেবারে টপ্‌কাইয়া উচ্ছৃঙ্খল গতি ধরিত না। ধর্ম্ম, কর্ম্মের রাস টানিয়া থাকিত বটে, কিন্তু তাহাকে চলিতে ফিরিতে দিত—প্রয়োজন হইলে নূতন পথে নূতন ক্ষেত্রে তাহার গতিও ফিরাইত। কিন্তু নির্জ্জীব ভারতে যখন কর্ম্ম অসাড় হইয়া পড়িল, যখন তাহার চেষ্টাশক্তি মুমূর্ষুর অঙ্গস্পন্দনবৎ ক্রমে প্রায় বিলীন হইয়া আসিল, তখন ধর্ম্ম তাহাকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিয়া খোঁয়াড়ে পূরিয়া ফেলিল। সেই সময়

হইতে কর্ম্ম কেবল চক্ষুদুটি মুদিয়া মাঝে মাঝে পূর্ব্বভুক্ত খাদ্যের অল্প অল্প জাবর কাটে, আর কিছু বড় তাহাকে করিতে হয় না।

(৫)

কথাটার ভিতর যে কিছুমাত্র সত্য নাই, তাহা বলিতে পারি না কর্ম্মবৈমুখ্যই যে কতকাংশে বিধিব্যবস্থাগত ধর্ম্মের প্রাধান্য বাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা না মানিবার কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই অবশ্য বিধিব্যবস্থার বন্ধন। সেই কর্ম্ম যদি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—শুধু খাওয়া, পরা, শোয়া, বসার মধ্যেই জীবনটা কোন রকমে একটু নড়িতে চড়িতে থাকে, তবে বিধিব্যবস্থার বন্ধন এই একঘেয়ে কর্ম্মের চারিদিকে দিন দিন খাঁজে খাঁজে কাটিয়া বসিবেই ত! কিন্তু যদি ভাগীরথীকে হিমাচলের শীর্ষ হইতে টানিয়া আনিতে হয়, যদি মৈনাকের দণ্ডে মহাসমুদ্র মন্থন করিতে হয়, যদি সেতুবন্ধন ও খাণ্ডবদাহনে সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে হয়—স্থূল কথায় যখন জীবনটা প্রজ্বলিত উল্কার মত বিপুল কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, তখন কি আর বিধি ব্যবস্থা একই অক্ষরে, একই মাত্রায় চিরদিনেরতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? তখন যে তাহাকে নিত্য নূতন কর্ম্মচক্রের মাঝে বিবর্ত্তিত হইতে হয়—একই স্থানে শ্মশানের বৃষকাষ্ঠের মত খাড়া হইয়া থাকিবার তাহার অবসর কোথায়?

সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা যে এতটা প্রভাবের হেতু ইহা স্বীকার করিতে কোন দোষ দেখি না। তবে হেতু হইলেও ইহাই একমাত্র হেতু নয়। হেতু আরো আছে। আমাদের মনে হয়, এই

সম্পর্কে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের রীতিটা বিশেষ লক্ষ্যনীয়। সকল দেশেই যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কতকটা শাস্ত্রের আকার ধারণ করে। প্রাচীন আচার, ব্যবহার, প্রথাবিশেষ কোন শাস্ত্রগ্রন্থের অনুমোদিত হউক আর না হউক, কালক্রমে শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই নিয়মে পুরাতন সাহিত্যও শাস্ত্রের সম্মান দাবী করে। কিন্তু এই দাবীটা ভারতে যতটা উপ্‌চাইয়া গিয়াছে, এমনটি কোনখানে হয় নাই। ভারতে যেন সংস্কৃত গ্রন্থমাত্রই শাস্ত্র অর্থাৎ ভারতবাসীর কর্ম্মনিয়ামক শাসনদণ্ড। বেদ বেদান্তের কথা মাথায় থাক, তাহা ত ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি, কিন্তু তাহা ছাড়া ছোট বড় যাহা কিছু সংস্কৃতের অন্তর্গত, কোনটাই বা ফেলা যায়। কাব্য, পুরাণ, নাটক, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ, উদ্ভট কোনটাই বা কম। বিচার বিতর্কে যেখান হইতে ইচ্ছা একটা শ্লোক আওড়াও—তা বিষ্ণু-পুরাণই হউক, আর গীতগোবিন্দই হউক, রঘুবংশই হউক আর পঞ্চ তন্ত্রই হউক, চানক্যই হউক আর চম্পূই হউক—সকল সময়ে এতটা উচ্চাঙ্গেরও প্রয়োজন নাই, যেন তেন প্রকারে দুটা বিসর্গওয়ালা অক্ষর থাকিলেই যথেষ্ট—আর তোমায় হারায় কে।

(৬)

সংস্কৃত-সাহিত্য শাস্ত্রবহুল তাহার উপর অধিকাংশই শ্লোক নিবদ্ধ কাজেই ইহার প্রভাবও তদনুযায়ী। ইহার যে দুই একটা অঙ্গ শাস্ত্র শ্রেণীর বহির্ভূত ছিল, কালক্রমে চারিদিক হইতে শাস্ত্রের বাতাস লাগিয়া তাহাও শাস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এই শ্লোকনিবদ্ধতাও ইহার প্রভাব ব্যাপ্তির কম অনুকূল নহে। সাদাসিধে গদ্যের কথায় ততটা

জোর দাঁড়ায় না। কিন্তু সেই একই কথা যদি শ্লোকের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তবে তাহার শক্তি যেন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। গদ্য শুধু কথা মাত্র, পদ্যে কথা ত থাকেই, তাহার উপর কিছু না কিছু সুর ও লয় আসিয়া যোগ দেয়। তাই কাটাখোট্টা গদ্য অপেক্ষা সুরলয় সমন্বিত পদ্যের প্রভাব অধিকতর তীব্র। শুধু তীব্র কেন, অধিকতর স্থায়ীও বটে। সাদা কথা যেন স্মৃতির উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে সুরলয় সংযুক্ত হইলে, তাহা সুরলয়ের সংঘাতে স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে। সম্ভবত সংস্কৃত-সাহিত্য শ্লোকনিবদ্ধ শাস্ত্র বচনের বাহুল্যে ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে এতটা তীব্র ও স্থায়ী রূপে গাঁথিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৭)

কিন্তু এখনও মূল কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মূল বলিতেছি কেন না এই কারণ না থাকিলে কালে অন্য কারণগুলা নিশ্চিতই হীনবল হইয়া পড়িত। দেবত্বের দাবী, অতীতের প্রতি ভক্তি, ও কর্ম্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা, শাস্ত্ররীতির বাহুল্য ও সুস্বর-শ্লোক-নিবদ্ধতা—এই সকল সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাবকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে বটে, কিন্তু এই সাহিত্যের ভিত্তি বিশাল প্রস্তরস্তম্ভের উপর না থাকিয়া যদি ধূলি রাশির উপর স্থাপিত হইত, তবে ঐ পাশের খুঁটিগুলা হাজার শক্ত হউক ইহাকে কখনই এতটা সমুন্নত রাখিতে সমর্থ হইত না। জানি, কালের করাল আঘাতে সেই প্রস্তর অনেক স্থানে ফাটিয়াছে, অনেক কাদা মাটি তাহাতে মিশিয়াছে এবং ফাটলে ফাটলে বহু আগাছা শিকড় চালাইয়া তাহাকে জখম করিয়াছে, তাহা হইলেও তাহার প্রস্তরত্ব

কখনই নষ্ট হইবার নহে। কঠোর সাধনা লব্ধ, মহা কল্যাণকর সত্য সমূহই এই পাষাণভিত্তি। এই সত্য সমূহ এই বিপুল সাহিত্যের নানা বিভাগে নানা আকারে অভিব্যক্ত, কোথাও দর্শনের যুক্তি ও তর্কে, কোথাও স্মৃতির বিধি ও নিষেধে, কোথাও কাব্যের অতুলনীয় আদর্শ বৈচিত্র্যে। কিন্তু এই বিশ্ব-জনীন্ সত্য যে কোথাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সংস্পর্শে মলিনীকৃত হয় নাই, এ কথা অতি বড় ভূতভক্তও বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন কি না সন্দেহ।

(৮)

যিনি পারেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিতণ্ডা করিবার এখন প্রয়োজন নাই। এই সংস্কৃতের প্রভাবকে এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া কে জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিয়াছে এখন আমরা তাহার একটু আলোচনা করিব। সংস্কৃতের প্রভাব কি সংস্কৃতই চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, না অন্য কাহারও ইহাতে হাত আছে? সংস্কৃত যখন জীবন্ত ভাষা ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে যখন এই ভাষার সাহায্যেই ভাবের আদান প্রদান চলিত, তখনকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ইহার তখনকার মূর্ত্তিও অবশ্যই বর্ত্তমান মূর্ত্তি হইতে অনেকাংশে ভিন্নতর ছিল। ব্যাকরণের নিয়ম নিগড়ে তখন ইহা এতটা আবদ্ধ হয় নাই এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রেই ইহা পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে এক নিয়মানুগত্য যত প্রবল হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রও যত বাড়িতে লাগিল, নানা মিশ্রণে বর্দ্ধিত জনসাধারণের পক্ষে ইহাকে সাম্যকরূপে অবলম্বন করিয়া থাকাও তত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

(৯)

কাজেই ইহার উপর নিয়মভঙ্গের মুদ্গরাঘাত পড়িতে লাগিল। প্রকৃতি প্রত্যয় কৃদন্ত তদ্ধিত সেই আঘাতে ভোঁতা বোঁচা ও চেপ্টা হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নানা নূতন আকার ধরিয়া বসিল। জনসাধারণ নিজের সুযোগ ও সুবিধার হাপরে ক্রমে একটা নূতন ভাষা গড়িয়া তুলিল। পণ্ডিতেরা এই নূতন ভাষার দাবী ক্রমে মানিয়া লইলেন। প্রাকৃত জনের সৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম রাখিলেন প্রাকৃত। সংস্কৃত সাহিত্য কেবল পণ্ডিতমহলেই আবদ্ধ ছিল, ক্রমে এই প্রাকৃতের ভিতর দিয়া জনসাধারণের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। সমাজে যাঁহারা জ্ঞান-বিদ্যায় মানমর্য্যাদায় বড়, তাঁহারাই সংস্কৃতের চলন রাখিলেন, আপামর জনসাধারণ প্রাকৃতকেই আশ্রয় করিল। রাজার দরবারে, পণ্ডিতের কারবারে সংস্কৃতের আদর রহিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের হাটে মাঠে ঘাটে প্রাকৃতই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। যে উচ্চমত ও আদর্শ এত-দিন সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল, তাহা ক্রমে অন্ততঃ কতকাংশে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে খোদ সংস্কৃত ছাড়া প্রাকৃতের কার্য্য বড় কম গণ্য নয়।

(১০)

কিন্তু প্রাকৃতের এই প্রাদুর্ভাবও চিরকাল রহিল না। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিসর দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। ক্রমে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধিকার-ভুক্ত হইয়া পড়িল। এত বিস্তৃত ভূভাগে, এত বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত রাখা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালক্রমে প্রাকৃতকে

শাণে চড়িতে হইল। আবার সে শাণ ও এক প্রকারের নহে, নানা দেশের উপযোগী নানা আকারের। প্রাকৃত এই নানা দেশের নানা আকারের শাণে চড়িয়া ক্রমে মাজিয়া ঘসিয়া নানা রূপে দেখা দিল। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাটী, গুজরাটী, উড়িয়া কত রূপই না তাহাকে ধরিতে হইল। আমরা বাঙ্গালা সাহিতের আলোচনায় প্রবৃত্ত, প্রাকৃত এই বাঙ্গালা রূপে দেখা দিয়া এখানে কি কার্য্য করিয়াছে, ইহাই এখন দেখিব।

(১১)

বাঙ্গালা দেশ প্রাকৃতকে নিজের শাণে চড়াইয়া অন্য দেশের অপেক্ষা কম ঘসা-মাজা করে নাই। সম্ভবতঃ বেশীই করিয়া থাকিবে। কারণ বাঙ্গালা দেশের প্রাণ বুঝি অন্যদেশের অপেক্ষা অধিকতর কোমল হইয়া পড়িয়াছিল। কঠোর শব্দটুকু বাহির করিবার জন্য যে শক্তিটুকুর প্রয়োজন তাহার প্রকাশে এই দেশটা বুঝি একেবারে অশক্ত না হউক, নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তৎসহ বৈষ্ণব সাহিত্য সোণায় সোহাগা হইয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তনের অবিরত মর্দ্দনে বাঙ্গালা দেশের ভাষাটা একেবারে যেন কাঠিন্য-মাত্র বর্জ্জিত কোমল মালপোয়া হইয়া গেল। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে বঙ্গ-সাহিত্য এই কোমলতার কিয়দংশ পরিহার করিয়া নানা দিকের ওজস্বী শব্দসংযোগে কিছু কাঠিন্য লাভে সমর্থ হইয়াছে।

(১২)

প্রাকৃত্যের অপত্যবৃন্দ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলেই প্রাকৃতের কাজে তাহারা বাহাল হইল। প্রাকৃত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া

প্রাচীন নাটকাদির অঙ্ক মধ্যে চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিলেন। প্রাকৃত একা এত কাজ সামলাইতে পারিতে ছিল না, এক্ষণে তাহার দুহিতারা সেই কাজ সকলে মিলিয়া বণ্টন করিয়া লওয়া তাহা অবশ্য ভালরূপেই সম্পন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালা বাঙ্গালা-দেশের কাজের ভার লইয়া কি করিল? অবশ্য এলোমেলো গৃহস্থালি গুছাইতেই অনেক দিন কাটিয়া গেল। তারপর সম্ভবতঃ কিছু কিছু সামাজিক ও সরকারি কাজে হাত দিতে তাহার সামর্থ্য জন্মিল। এই-রূপে কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বাড়িয়া চলিল। কার্য্যক্ষেত্রের আয়তন অনুসারে কর্ম্মপটুত্ব ও ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। কালক্রমে যখন ইহা বৈষ্ণব যুগে আসিয়া সমুপস্থিত, তখন দেখি ইহার একাঙ্গে প্রায় পূর্ণ বিকাশের অবস্থা। তখন দেখি ইহা অন্যান্য ছোট বড় কাজে সম্পূর্ণ যোগ্য ত বটেই, তাহা ছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ। ক্রমে এই বিশেষ যুগে ইহা এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল যে তাহার দ্বারা বৈষ্ণব কবিগণ যে অতুলনীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এই উন্মেষ ও পরিপুষ্টি কিছু একপেশে রকমের। সম্ভবতঃ মাতামহী সংস্কৃতের দেখা-দেখি বাঙ্গালা ভাষাও পদ্যের বেশী পক্ষপাতী হইয়াছিল। তাই বৈষ্ণবের গীতিকবিতাতে পদ্যের বিকসিত মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। গদ্য অবশ্য তখনও ছিল—বেচা-কেনা হিসাব-নিকাশ ও গৃহস্থালি কখন চরণে চরণে মিলাইয়া চলিতে পারে না—কিন্তু তাহা সাহিত্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। সে যোগ্যতা লাভের জন্য গদ্যকে আরো কত শত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এক বিভিন্ন প্রকৃতির বিদেশী সাহিত্যের সংস্পর্শে না আসিলে আরো কত দিন

অপেক্ষা করিতে হইত তাহা কে জানে। থাক, সে কথা এখনকার নয়।

(১৩)

এক্ষণে এই বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে ও কতটা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে, ইহাই দ্রষ্টব্য। প্রাকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে কতকটা বিস্তৃত করিয়াছিল, ইহা মানিতে হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রাকৃতের দুহিতাদিগের কার্য্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু প্রাকৃত—অবশ্য বৌদ্ধ প্রাকৃতের কথা স্বতন্ত্র—একটা বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি বড় করে নাই। সংস্কৃত সাহিত্য এই প্রাকৃতকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু প্রাকৃতের দুহিতাদিগের বেলা সে নিয়ম খাটে নাই। নিশ্চয়ই দূরসম্পর্কবশতঃ উভয় পক্ষের সাদৃশ্যগত যোগও ততটা থাকিতে পারে না। জননীর সহিত দুহিতার যতটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব, মাতামহীর সহিত দৌহিত্রীর ততটা সাদৃশ্য না থাকিবারই কথা। যাহাই হউক, ইহা দেহিত্রীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। মহাসম্পদশালী সংস্কৃত সাহিত্যের সাহচর্য্য অবশ্যই গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু সতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব কম গৌরব-জনক নহে। অন্যের কথা ছাড়িয়া বাঙ্গালার কথাই বলি। যদি প্রাকৃতের মত আমাদের এই বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের সহিত জড়িত থাকিত, তবে ইহার এতটা উন্মেষ ও উন্নতি কি কোন কালে ঘটিয়া উঠিত? ইহার স্বাতন্ত্র্যই ইহাকে এমন শক্তি দিয়াছে, যাহাতে এই সাহিত্য এক দিন বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবার স্পর্দ্ধা রাখে।

প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব বজায় রাখিতে সমর্থ। কেন? কারণ প্রাকৃত সংস্কৃতের অঙ্গমাত্র,

বাঙ্গালা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষা। বাঙ্গালার অনুবাদ-সাহিত্যের সাহায্যে সংস্কৃতের প্রভাব যতটা বাঙ্গালায় বিস্তৃত হইতে পারে প্রাকৃতের দ্বারা ততটা হইতে পারে না। পুচ্ছগ্রাহিতা ও স্বাতন্ত্র্যের এই প্রভেদ। আধুনিক অনুবাদ-সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিতেছি—তাহা ত আগম নিগম দর্শন পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গই সাধারণের মধ্যে প্রচারে উন্মুখ—প্রাচীন অনুবাদ-সাহিত্যও এই হিসাবে বড় কম কাজ করে নাই। আগম, নিগম, দর্শন সাধারণের নিকট প্রচারিত হইলেও সাধারণ তাহা ধরিতে ছুঁইতে পারে না, পুরাণের মনোমহিণী আখ্যানমালাই তাহাদের সমধিক চিত্তাকর্ষক। তাই কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে কাশীরাম ও কৃত্তিবাস যাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা অনুবাদ সাহিত্যে অতুলনীয়। বেদ বেদান্ত পণ্ডিতদিগের জন্য, পুরাণসমূহ বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় লোকশিক্ষার প্রধানতম সাধন। এই রামায়ণ ও মহাভারতকে যাঁহারা জনসাধারণের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন্য।

(১৪)

পুরাতন অনুবাদ-সাহিত্য আরো অনেক থাকিতে পারে কিন্তু তাহার অধিকাংশই শুধু প্রত্নতত্ত্বের কুক্ষিগত হইয়াই এখন বর্ত্তমান। সে সকলের উল্লেখ এ ক্ষেত্রে নিস্প্রয়োজন, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসই এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার জিনিস্। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের পুরাণাখ্যান অনুবাদ-সাহিত্য বলিয়া আখ্যাত বটে কিন্তু তাহা যথার্থ অনুবাদ নহে। কালীসিংহের ও বর্দ্ধমান রাজবাটির মহাভারত যে হিসাবে অনুবাদ, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস সেরূপ কিছু নহে। আক্ষরিক সাদৃশ্য

দূরে থাকুক, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধেই মূলের সহিত ইহাঁদের পার্থক্য আছে। ইহাঁরা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভারত খুলিয়া আভিধানিক আলঙ্কারিক বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহের নির্ণয়পূর্ব্বক একটী খসড়া করিতে বসেন নাই। তাঁহারা হাতের কাছে অতি সহজে যে উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে নিজেদের এই অপূর্ব্ব কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছেন।

(১৫)

এখন যেমন অসংখ্য গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকশিক্ষার কাজ করিতেছে, পূর্ব্বে ত এমন ছিল না। তবে লোকশিক্ষা চলিত কি প্রকারে? এখন আক্ষরিক জ্ঞানও বিদ্যালয়সমূহের সহায়তায় চারিদিকে বিস্তার লাভ করিতেছে কিন্তু পূর্ব্বে এই জ্ঞান বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিরক্ষরের শিক্ষা হইত কি উপায়ে? ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর লোকশিক্ষক ছিলেন এখনও আছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অবশ্যই তাঁহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় ইহাঁদের নাম কথক। এই কথকেরাই অন্ততঃ কতকাংশে তখন মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য করিতেন। তাঁহারা বেদ বা উপনিষদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। ততটা পাণ্ডিত্যেরও তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহারা বুধমণ্ডলীর জন্যও দেখা দেন নাই। ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার কিয়দংশ জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই ছিল ইহাঁদের প্রধানতম কার্য্য। সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত দার্শনিক আলোচনার দরকার হয় নাই। সাধারণের সম্মুখে দর্শন চিরকালই অদর্শন। এস্থলে লোকবিমোহন

উপাখ্যানমালা অবলম্বন করাই শিক্ষকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। কথক-শ্রেণীর মধ্যে এই নিদর্শনের অভাব লক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা দর্শন ছাড়িয়া পুরাণকেই বেশী করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

(১৬)

এই পুরাণে অবশ্যই অনেক আজগুবি গল্প আছে, অনেক অসম্ভব অনুষ্ঠান আছে, অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ আছে। কথকেরা সেই অপ্রাকৃত ও অসম্ভবকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। বরং মূলে যাহা সম্ভবপর ছিল, তাহাকে অসম্ভবই করিয়াছেন, যাহা অসম্ভব ছিল তাহা আরো বহু পরিমাণে অদ্ভুত করিতে ছাড়েন নাই। এবং যাহাকে কোন রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করা যাইত, তাহার উপর গাঢ় রংয়ের পোঁচ লাগাইয়া প্রকৃতির নখাগ্রের সামান্য দাগটুকু পর্য্যন্ত শেষ করিয়া দিয়াছেন। ব্যাস ও বাল্মীকির কাছে পঞ্চভূত নিশ্চয়ই এতটা লাঞ্ছিত হয় নাই।

পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি ছাড়া এই কথকদিগের নিকট আখ্যানান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতিও অনেক লাঞ্ছিত হইয়াছে। শুধু প্রকৃতি কেন সেই ব্যক্তিবর্গের আকৃতিও যে কিছু বিড়ম্বনা সহিয়াছে একথাও বলা চলে। তাঁহারা যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেখানেই কাহারও পুচ্ছ, কাহারও কর্ণ, কাহারও নাসিকা টানিয়া যতদূর পারেন লম্বা করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা আকৃতিসম্বন্ধে তাঁহারা বাড়ানর দিকেই গিয়াছেন, কমানর দিকে একেবারেই যান নাই। কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধে ঠিক বিপরীত ঘটিয়াছে। মূলে যিনি যতটা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অনুবাদে তাহাদের মধ্যে অনেককেই কিছু খাটো হইতে

হইয়াছে। বীরের বীরত্ব, মহতের মহত্ব এমন কি ধীরের ধীরত্বও মূলের অনুসারে যথাযথ অঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু ইহাঁদের নিকট সেরূপ আশা করাই অন্যায়। ব্যাস ও বাল্মীকির দ্বারা ইহাঁরা ঠিক অনুপ্রাণিত নহেন। ব্যাস ও বাল্মীকির প্রতিভাই বা ইহাঁরা কোথায় পাইবেন ?

(১৭)

আমরা কথকদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কাশীদাস ও কৃত্তিবাসে তাহা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। কারণ ইহাঁরা কথককবি। পূর্ব্বগামী কথকদিগের অনুসরণেই ইহাঁদের কাব্য রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যে অসম্ভব, অপ্রাকৃত, আজগুবি বহুল পরিমাণেই দেখা যাইবে ঘটনাপুঞ্জের সামঞ্জস্যের অভাবও অনেক লক্ষিত হইবে, অনেক স্থলে খুব মহৎকেও অপেক্ষাকৃত হীন দেখাইবে। কিন্তু সমগ্র কাব্য জন-সাধারণের শিক্ষাকল্পে যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনায় এইসকল দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। প্রাচীনকালের বিশিষ্ট উচ্চ বংশের বৃত্তান্ত কতক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণের ইতিহাস বড় কিছু নাই। পৌরাণিক যুগে এই জনসাধারণের শিক্ষা কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পাদিত হইত, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কথকতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষার একটা যে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, এটা বেশ বুঝিতে পারি। কারণ এই কথকতার উপর প্রতিষ্ঠিত কাশীরামী-মহাভারত ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণের কার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অনুবাদ-সাহিত্য সাধারণের উপর মূল সাহিত্যের প্রভাব কতদূর

জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শুধু সংস্কৃতের গণ্ডী কতটুকু—সংস্কৃত শিক্ষা ত মুষ্টিমেয়ের মধ্যে আবদ্ধ। অবশিষ্টের উপায় কি? মূল অপেক্ষা অনুবাদ-সাহিত্যই ইহাদের সাক্ষাৎ শিক্ষক, গুরু ও উপদেষ্টা। এই সাহিত্যই মহান্ চরিত্রের চিত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া মানুষের মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে স্বার্থ ও পরার্থ, সংযম ও স্বেচ্ছাচার, ভোগ ও ত্যাগের তারতম্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগের চিত্তে উচ্চ বৃত্তি-নিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। সংসার, সমাজ ও সাম্রাজ্যগত কর্ত্তব্যসমূহের আদর্শালোক এই অনুবাদ-সাহিত্যের উপগ্রহ হইতেই জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে। মূল গ্রহের সহিত ইহাদের পরিচয় খুবই কম। ব্যাস ও বাল্মীকির কাব্য সাধারণের নিকট কতকটা যেন বিষ্ণুপদ বা গোমুখীধারা, এতটা উচ্চে তাহারা উঠিতে অক্ষম—তাঁহারা কাশীরাম বা কৃত্তিবাসী অনুবাদ-সাহিত্যের ভাগী-রথীতে অবগাহন করিয়াই কৃতার্থ।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

পয়লা নম্বর।

—:০:—

আমি তামাকটা পর্য্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্য্যন্ত শুকিয়ে মরে গেচে। সে আমার বই পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই :—

যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার সখ বেশী অথচ পাথেয়ের অভাব, তারা যেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়-শ্বশুর বাংলা বই বেরবামাত্র নির্ব্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহঙ্কার এই যে সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্য্যন্ত খোওয়া যায় নি। বোধ হয় বাংলাদেশে এমন সৌভাগ্য আর কারো ঘটে না। কারণ ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্চে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ির পক্ষেও দুর্লভ ছিল। "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে" আমি যখন ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আল্‌মারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েচি। তখন

আমার চক্ষুর জিভে জল এসেচে। এই বল্লেই যথেষ্ট হবে ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব রকম বেশী পড়েচি যে, পাস্ করতে পারি নি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল্-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘড়ায়, বিদ্যার তোলা জলে, আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বিএ, এম্এ, এসে থাকে; তারা যতই আধুনিক হোক্ আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মত, আঠারো উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা, বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহুকষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল রাস্কিনে এসে কাৎ হয়ে পড়েচে। মাষ্টার মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরয় না।

কিন্তু আমরা যে-দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মত করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্চি সেদেশে সাহিত্যটা ত স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেচি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী জর্ম্মাণ ইটালিয়ান শিখে নিলুম; অল্পদিন হল রাশিয়ান শিখতে সুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্স্প্রেস্ গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেচে, আমি তারই টিকিট কিনেচি। তাই আমি হাক্সলি ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাই

নি, টেনিসন্‌কেও বিচার করতে ডরাইনে, এমন কি, ইবসেন মেটার-লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখচি বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু'চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে: দেশের চারদিকে সাময়িক ও অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি তা একদিকে এত কাঁচা অন্যদিকে এত পুরণো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্চে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারো সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্রচিহ্নিত একখানা নূতন প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায় তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ বা সদ্য কলেজের নোট নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো

তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেচি সাহিত্য চর্চ্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয় রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কি হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে সকল বড় বড় কুলাল চক্র ঘুরচে, যাতে মানব সভ্যতা কতক বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠচে, কতক বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়চে তার কাছে ঘর-করনার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে?

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গী ভবই জানেন এমন কথা কাব্যে পড়েচি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার এক জোড়ামাত্র—তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বল্লে আমার স্ত্রীর ভ্রূ-চাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তাল-কানা, এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থসামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্চে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মত এই আমার সখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশী জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার

করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্চে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়াম-প্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিম্বা অধ্যাপক হতুম তাহলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের উপর হন্‌হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার দ্বৈত দলটি জমে নি—তখন আমার একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেচেন। যদিচ তিনি পরতেন মিল্‌-এর সাড়ি, এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে-আলাপ শুনতেন—সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বল, মেণ্ডেল তত্ত্বই বল, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বল—তার মধ্যে সস্তা কিম্বা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দল বৃদ্ধির পর হ'তে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন কিন্তু সেজন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনি নি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কি তা আমি জানি নে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয় ওর একটা কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ি যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোট ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায়স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হয়েছিল তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে তিনি

অনিলার হাত ধরে বল্লেন, "মা, আমি ত যাচ্চি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কি ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বল্লেন, এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই—নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারো উপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার উপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য এমন ধারণা যে তাঁর কি করে হল তা ত বল্‌তে পারি নে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তাহলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না। আসল তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারেন নি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইওনি। বিশ্বাস ছিল কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম ও বুঝি সাহস করচে না। শেষে একদিন কথায়

কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কি করচ ?" অনিলা বল্লে, "মাষ্টার রেখেচি, ইস্কুলেও যাচ্চে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজি আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নতুন প্রণালী বেরিয়েচে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁও বল্লে না, নাও বল্লে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করিনি সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। এতদিন ওকে সৌজাত্য, অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিয়ো-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেচি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝে নি। ও হয়ত মনে করেচে সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশী জানে। কেননা মাষ্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেচে। রাগ করে মনে মনে বল্লুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড় বড় জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার দ্বৈতদের নিয়ে বের্গসঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইবসেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করচি তখন মনে করেছিলুম অনিলার জীবন-যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলে নি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই যে-সৃষ্টিকর্ত্তা আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন অনিলার মর্ম্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোটভাই,

একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে-মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন করতে হয় তার সে-পৃথিবী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠচে। সেই চল্‌তি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকরনার খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন চল্‌তে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে? অন্তত আমি ত কিছুই বুঝি নি। কত উদ্বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠছিল আমি তা জানিই নি। আমি জানতুম যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগ পর্ব্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব্ব। আজ বেশ বুঝতে পারচি পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোটভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাই নি, তার যে কি রকম চল্‌চে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করি নি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সেকালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তারপরে দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধন জন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেচে, দুটি একটি বিধবা বাকি আছে। তাঁরা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্পদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে

থাকে, বাকি সময়টা এত বড় বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন—মনে কর তাঁর নাম রাজা সিতাংশু মৌলি—এবং ধরে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তম পুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড় একটা আবির্ভাব আমি হয়ত জানতেই পারতুম না। কারণ, কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্চে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্ম্মটি খুব মজবুৎ ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারদিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়মানুষরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশী, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত। দু হাত দু পা এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেচে তারা হল দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের পরে মন দেবার কোনই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্চে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম সিতাংশু মৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন লোক যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না। গাড়ি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়ে সে যেন দশ মুণ্ড বিশ হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মত আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পথ-চল্‌তি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনাসম্বন্ধে মনে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড "হেইয়ো" গর্জ্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্চেন, পাশে তাঁর কোচমান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেচেন। আমি কোনোমতে সেই সঙ্কীর্ণ গলির পার্শ্ববর্ত্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ। কেননা যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি। পদাতিকের দুটিমাত্র পা, সে হচ্চে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে-ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথী সবাইকেই যথা সময়ে ভুলে যেতুম। কারণ এই পরমাশ্চর্য্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোল-

মাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশী জবর দখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমার তিন নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি কিন্তু আমার এই পয়লা নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তার আট দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের উপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্ব্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোর বেলায় সেই আট দশটা ঘোড়াকে আট দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তার পরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারি দরোয়ানের দল কেউই স্বর সংযম কিম্বা মিত-ভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্চে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়ত ঘুমের ব্যাঘাত হত না কিন্তু তার প্রতিবেশির কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্চে পরিমাণ-সুষমা, অপর পক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দন-শোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিতি দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেচে। তাকে যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসে নি; আমি বসে বসে জোয়ার ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম এমন

সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশির একটা স্মারক-লিপি ঝন্ ঝন্ শব্দে আমার শাসির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ির চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতি-কাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, এবং অত্যন্ত বেশী করে আছেন; আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। এ'কে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত করতে পারিনে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি বিনা তাগিদেই গোলা কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌চে। খবর পেলুম প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম কেবল যে আমার শাসি ভাঙচে, আমার শান্তি ভাঙচে তা নয়, আমার অনুচর পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠ্‌চে, সেটা তেমন আশ্চর্য্য নয় কিন্তু আমার দ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রধান সর্দ্দার কানাই লালের মনটাও দেখচি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণ মূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুট্‌চে। বুঝলুম এই উপলক্ষ্যে প্রতিবেশির সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল ওর

মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বল্‌তুম সাজ সজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙীন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বল্লে, "মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি এ পাস করেচে।" কানাইলাল স্বয়ং বিএ পাস করা, এ জন্য ঐ ডিগ্রিটা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারলুম না।

পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিনি তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন, কর্ণেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন-তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি,—তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত। আজও যে সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালবাসে। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম আমার দ্বৈত দলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা নম্বরে চেলো বেজে উঠ্‌লেই যারা গাণিতিক ন্যায় শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেল্‌চে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বল্‌লে, পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত জুটেচে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই ত ভাল হয়।

বড় খুসি হলুম। আমার দলের লোকদের বল্লুম, "দেখেচ মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে। তাই, যে সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না কিন্তু যে সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই, তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বল্লে "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোর মাহাত্ম্য, পতি দেবতা পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বল্লুম, "না হে, এই দেখ না আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁক জমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেচি কিন্তু অনিলা ওর সাজসর্জ্জায় ভোলে নি।"

অনিলা দু'তিনবার বাড়ী বদলের কথা বল্লে। আমার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মত অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেল বেলায় দেখা গেল কানাই-লাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস্ খেল্‌চে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল যতী আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিশে একজন বক্স হার্ম্মোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে' খুব প্রতিপত্তি লাভ করেচে। এদের আমি পাঁচ ছ' বছর ধরে জানি কিন্তু এদের যে এ সব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করি নি। বিশেষতঃ আমি জানতুম অরুণের প্রধান সখের বিষয় হচ্চে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব, সে যে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি করে বুঝব?

সত্য কথা বলি আমি এই পয়লা নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড় বড় সমস্যার

সামাধান করতে পারি—মানসিক সম্পদে সিতাংশু মৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেচি। কেন সে কথা যদি খুলে বলি ত লোকে হাসবে। সকাল বেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরত—কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, আহা আমি যদি এই রকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম! পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের পরে আমার ভারি একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের সুর ভালো বুঝিনে কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেচি সিতাংশু এস্রাজ বাজাচ্চে। ঐ যন্ত্রটার পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্য্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী নারীর মত ওকে ভালবাসে—সে আপনার সমস্ত সুর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েচে। জিনিস-পত্র বাড়ি ঘর জন্তু মানুষ সকলের পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারি একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্ব্বচনীয়, আমি এ'কে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনিই এঁর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেই খানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস খেলতে কন্সর্ট বাজাতে লাগ্‌ল তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিলে মনের মত অল্প বাসা বরানগরে কাশিপুরের

কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজি। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্না ঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বল্লুম, "পর্শুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বল্লেন "আর দিন পনেরো সবুর কর।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?"

অনিলা বল্লেন "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভাল লাগচে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে এই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করি নে। সুতরাং আপাতত কিছু দিন বাড়ি বদল মুলতবি রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে বেরবে সুতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন 'আজ রাত্রে আমাদের দ্বৈত দলের পূর্ণিমার ভোজ। তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভি-প্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম "আজ রাত্রে রান্নার জোগাড় সব ঠিক আছে ত?" সে কোন জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে আছে।

আমি বল্লুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভাল লাগে, সেটা ভুলো না।" এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে।

আমি বল্লুম, "কানাই, আজ তোমরা একটু সকাল সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "সে কি কথা? আজ আমাদের সভা হবে না কি?"

আমি বল্লুম, "হবে বৈ কি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গসঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন কি আমড়ার চাটনি পর্য্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বল্লে, "অদ্বৈত বাবু, আমি বলি আজ থাক্।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জান্‌তে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল বেলায় আত্মহত্যা করে মরেচে। পরীক্ষায় সে পাশ হতে পারে নি তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায়চাদর বেঁধে মরেচে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুন্‌লে?"

সে বল্লে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে!—বিবরণটা এই:—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশু মৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সংকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েচে। কিন্তু এবারে গিয়ে দেখি ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করেচে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দে'লুম তখন বুঝলুম একরাত্রে তার জীবনটা উলট পালট হয়ে গেচে।

আমি অভিযোগ করে বল্লুম, "আমাকে কিছু বল নি কেন ?"

সে তার বড় বড় দুই চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বল্‌ত, "তোমাকে বলে লাভ কি ?" তাহলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাক্‌ত না। জীবনের এই সব বিপ্লব, সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে কি করে যে ব্যবহার করতে হয় আমি কি তার কিছুই জানি ?

আমি বল্লুম, "অনিল, এ সব রাখ, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বল্লে, "কেন হবে না, খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেচি সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বল্লুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বল্লে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড় বড় বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেচে। যদিচ সব কথা বোঝবার মত শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু পার্সোনাল্ ম্যাগ্নেটীজ্‌ম্ বলে একটা জিনিস আছে ত।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈত দলের দুই চার জন কম পড়ে গেল। কানাইত এলই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসে নি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশু-মৌলি চলে যাচ্চে তাই এরা সেখানে বিদায় ভোজ খেতে গেছে। এ দিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনো দিনই করে নি। এমন কি, আমার মত বেহিসাবী লোকেও এ কথা না মনে করে থাক্‌তে পারে নি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েচে।

সে দিন খাওয়া দাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম "শোবে না ?" সে বল্লে, "বাসন গুলো তুল্‌তে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চষমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি আমার চষমা চাপা দেওয়া একটুক্‌রো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে,—"আমি চল্লুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।"

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন কি তার হাতের চুড়ি বালা পর্য্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের লোহা ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোচ্ছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের মোড়কে করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ কাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমে ছিল তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন কোসন জিনিস পত্রের ফর্দ্দ, এবং ধোবার বাড়িতে যে সব কাপড় গেছে তার সব

হিসাব। এই সঙ্গে গয়লা বাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোঁকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এই টুকু বুঝতে পারলুম অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখ্‌লুম—আমার শ্বশুর বাড়িতে খোঁজ নিলুম কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘট্‌লে সে সম্বন্ধে কি রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয় কোনদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাই নে। বুকের ভিতরটা হা হা করতে লাগ্‌ল। হঠাৎ পয়লা নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজি গড়গড়ায় তামাক টানচে। রাজাবাবু ভোর রাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠ্‌ল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানবসমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টল্‌স্টয়, টুর্গেনীভ প্রভৃতি বড় বড় গল্প-লিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েচি তখন বড় আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তার তত্ত্ব কথা বিশ্লেষণ করে দেখেচি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘট্‌তে পারে তা কোনো দিন স্বপ্নেও কল্পনা করি নি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সাম্‌লে নিয়ে আমি প্রবীন তত্ত্বজ্ঞানীর মত সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হাল্‌কা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যে দিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেই দিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা কত আয়োজন কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন কত রাত্রি কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল; স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম এমন সময় আজ হঠাৎ চোখ খুলে দেখি বুদ্বুদ

ফেটে গিয়েচে। গেছে যাক্‌গে—কিন্তু জগতে সবই ত বুদ্‌বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিঁকে রয়েচে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিন্‌তে শিখি নি?

কিন্তু দেখলুম হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য কালের জ্ঞানীটা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে, যেখানে জানালার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখেচি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মত সমস্ত জিনিস পত্র ঘাঁটতে লাগ্‌লুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুল্‌তেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা একতাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা নম্বর থেকে এসেচে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড় বেদনা সেইখানেই ভয়ঙ্কর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন চার টুক্‌রো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেচে। সে চিঠিখানা এই:—

"আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেল তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বল্‌তেই হবে।

আমি তোমাকে দেখেচি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্চি কিন্তু দেখবার মত দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে

প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দ্দা টানা ছিল; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েচ—আজ আমি নব জাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম—যে-তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্ব্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েচি, আর কিছু চাই নে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবেনা জানি —কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পার তাতে তোমারও ভাল হবে। আমি কে সে-কথা লেখবার দরকার নেই কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপনে থাক্‌বে না।”

এমন পঁচিশ খানি চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোন নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠ্‌ত;—কিম্বা তাহলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তব গান নীরব হত।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেচে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দ্দা কত মোটা পর্দ্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিই নি। আমি আমার দৈত্যদলকে এবং নব্য ন্যায়কে

তার চেয়ে অনেক বড় করে দেখেচি। সুতরাং যাকে আমি কোন দিনই দেখি নি, এক নিমেষের জন্যও পাই নি, তাকে আর-কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কি-বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব?

শেষ চিঠি খানা এই :—

"বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানি নে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেচি তোমার বেদনা। এই খানে বড় কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে স্বর্গমর্ত্তের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আমি। তার পরে এও মনে হয় তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্য্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোর বেলা পর্য্যন্ত মেয়াদ নিয়েচি। এর মধ্যে যদি কোন দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—এক মনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক্।"

বোঝা যাচ্চে দ্বিধা দূর হয়ে গেছে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেচে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কতকাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভাল লাগে না। অনিলকে একবার কোন মতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম সিতাংশু তখন মসূরি পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেচি কিন্তু তার সঙ্গে ত অনিলকে দেখি নি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু "বল্লে আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটি-মাত্র চিঠি পেয়েচি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে একটি ছোট এনামেল করা সোনার কার্ড কেস্ খুলে তার ভিতর থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চল্লুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। কর্‌লেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ। এবং যে নীল রঙের চিঠির কাগজের অর্দ্ধেকখানা আমার কাছে, এই টুক্‌রোটি তারি বাকি অর্দ্ধেক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৌতুকময়ী।

——ঃ৹ঃ——

সে এক তরুণী বালা দিবস নিশায়
বাহি লয়ে চলে' যায় তরণী আমার,
সে যে মোরে দিবানিশি কাঁদায় হাসায়,
তাহার এ পারাবারে নাহি পারাপার;—
সে মোরে বাহিয়া নেয় দিগন্তের পানে।
যবে মেঘলুপ্তাকাশে বিদারে অশনি
আমি শুধু ভয়ে মরি, সে যে হাসি গানে
আমারে কৌতুক হানে কৌতুক-চাহনি।
সান্দ্র শুভ্র জ্যোৎস্না তল ভরি অশ্রুজলে
কাঙাল নয়ন তার চায় মোর পানে;
ব্যথায় গুঞ্জন ওঠে হৃদয় কমলে,
বৃথা সদা খুঁজি তারে জীবনের গানে,—
সে এক রহস্যময়ী সে এক তরুণী
সদা বাহি লয়ে চলে আমার তরণী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

——

শ্রাবণ, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

২৭

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রাণের কথা।

(ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে কথিত)

এ রকম সভার সভাপতির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রবন্ধ পাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য। ইংরাজীতে যাকে বলে mutual admiration, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি, অথচ একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক্ বন্ধুস্তুতি সাহিত্য-সমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু, আমি বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে কারণ আবার একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে, অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে, আমি প্রবন্ধ-লেখকের আর কিছুর না হোক্, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্ব্বোধ্য

অর্থাৎ জীবন, ঘটক মহাশয় তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটক মহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে উপনিষদের সময় থেকে সুরু করে অদ্যাবধি নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক, জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ করতে পারেন নি, যার উপর আর টীকা টীপ্পনি চলে না।

আমার মনে হয় দর্শন বিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে, হয় অনন্ত জীবন নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্ব্বাণ। এর কোন অবস্থাতেই জীবনের আর কোনই সমস্যা থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি, তাহলে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না—অপর পক্ষে যদি নির্ব্বাণ লাভ করিত জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সমগ্র মানবজাতি, না-মরাতক্ এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করতে পারবে না। আর যদি কোনদিন পারে তাহলে সেই দিনই মানবজাতির মৃত্যু হবে কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিম্বা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয় হওয়া অর্থাৎ মৃত হওয়া, কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয় বিশেষণও নয়—ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই

বলে এ রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা, যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা হয় একটা অর্থ স্থির করে না নিলে, মানুষে জীবন-যাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎ-সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

(২)

সতীশ বাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একই রকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শন বিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি, কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের

নিত্য কারবার করতে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজ জ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানিনে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দু রকম ভাবে বলা যায়। এক জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু— আর এক জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-তত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এ দুয়ের কোন মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না, অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য করো না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এরকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না—তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে, একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির দর্শন।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং, কেউ প্রমাণ করতে চান যে প্রাণ দেহের বিকার আর কেউ বা প্রমাণ করতে চান যে প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারও মতে প্রাণ মূলতঃ আধিভৌতিক কারও মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়—কালের গুণে কখনো এ মত কখনো ও মত প্রবল হয়ে ওঠে। সে মতের গুণে নয়—যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস যে একটি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মূলে একই মত। কেননা উভয়

মতেই এমন একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের কল্পনা করা হয় যার আসলে কোনও স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় ও মধ্য পন্থাও আছে, সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্ত্বা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম Vitalism এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস অ-প্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না, যে প্রাণ কখনো অ-প্রাণে পরিণত হবে না। তারপর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয়—তাহলে প্রাণকেই জগতের মূল পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বল্‌তে পারি, জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড়প্রাণের সুপ্ত অবস্থা আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে প্রাণও আছে মনও আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় আরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্ম্মাণ দার্শনিক হেকেল এবং জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এ সব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না—তার কারণ—

সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহ মনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে, মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শন বিজ্ঞানের মন-গড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

(৩)

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না শুধু তাই নয় Vitalism কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। Vital force নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোট বড় নিয়মের অধীন তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন এ কথা বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন মূলতঃ তা যে, অভিন্ন এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহুচেষ্টা হয়েছে কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয়নি। প্রাণ জড়জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি বাঙ্গলা তা করেছে, অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু,

হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সর্ব্বাগ্র-গণ্য-বিজ্ঞানাচার্য্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি, যে জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার ধারণা তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয় তার লক্ষণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্। মানুষমাত্রই জানে যে যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমন কি ছোট ছেলেরাও জানে যে গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ যে গুণে সমধর্ম্মী—সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, assimilation এবং reproduction—এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সধর্ম্মী। অর্থাৎ—এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের Least—Common Multiple এ কালের স্কুলের বাংলায় যাকে বলে "লসাগু"।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ দুই ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্ম্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্চে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে, ও বস্তু আমাদের মতই সাড়া দেয় অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এক কথায় আচার্য্য বসু উদ্ভিদ জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা উদর ও মিথুনত্বের সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। বসু মহাশয়, প্রাণের "লসাগু"তে সন্তুষ্ট না থেকে তার "গসাগু" অর্থাৎ Greatest Common Measureএর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে,

তখন সম্ভবতঃ কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না,—কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই, তখন হৃদয় মস্তিষ্কাদি থাক্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোশ নেই তার অন্তরে মনোময় কোশের দর্শনলাভ তাঁরাই কর্‌তে পারেন, যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

(৪)

আমি বৈজ্ঞানিকও নই দার্শনিকও নেই, সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকার চর্চ্চা করলুম তার ভিতর চাই কি কিছু সার নাও থাক্‌তে পারে। কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার আমাদেরও মীমাংসা কর্‌তে হবে আর কিছুর জন্য না হোক শুধু প্রাণধারণ কর্‌বার জন্য। আমাদের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্চে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্চে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত। প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদ জ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা যে গুণে প্রাণী-জগতে মানুষ অসামান্য—সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্ম্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারিনে, কোন্ কোন্ ধর্ম্মে আমরা ও দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবন-যাত্রার প্রধান সহায়, এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনরূপ অনুমান প্রমাণের দরকার নেই প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখ্‌তে পাই যে, উদ্ভিদ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এক কথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে স্থিতি।

তারপর দেখ্‌তে পাই পশুরা সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে গতি।

তারপর আসে মানুষ। যে হেতু আমরা পশু—সে কারণ আমাদের গতি ত আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে মতি।—

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধরাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে গণ্ডীবদ্ধ অর্থাৎ উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধজীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত—কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে—আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না, যে মানুষের পক্ষে প্রাণী-জগতে পশ্চাৎপদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত্ত অবস্থারই এমন সব বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে যা, তার অপর মূর্ত্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ্‌ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপর পক্ষে তার সুবিধা

এই যে তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম কর্‌তে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়—সে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে যেতে পারে, এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবনধারণ কর্‌তে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই সামিল—কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক্ শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়, সে স্থান ত্যাগ কর্‌তেও পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। এ কালের ভাষায় যাকে "বেষ্টনী" বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতি গতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে তাকে জীবনধারণ কর্‌বার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয় মন খাটাতে হয় না, উদ্ভিদকে শরীর মন দু'য়ের কোনটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক্ মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর মন দু'য়ের কোনটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব—আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা উদ্ভিদকে আদর্শ করে তুলব—এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠিত কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। "স্বধর্ম্মে নিধনো-

শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ” এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে বাইরে যে গতি-শক্তি আছে তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতি গতির শুভ পরিণয়ের বলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি।—আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে' তোলা ছাড়া আয়ুঃবৃদ্ধির অপর কোনও অর্থ নেই।

২৪শে জুন ১৯১৭।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কথা ও সুর।

——:০:——

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমি এক সময়ে এই মত প্রকাশ করি যে, কথার রস ও সঙ্গীতের রস এক বস্তু নয়, ; এবং অধিকাংশ লোকে সঙ্গীতরসের রসিক না হলেও, তাঁরা যে গান শুনতে ভাল-বাসেন তার কারণ,—তাঁরা সুরসংযুক্ত কথার রসে মুগ্ধ হন। কথার রস অবশ্য প্রধানতঃ তার অর্থের উপর নির্ভর করে, অতএব কথার রস উপভোগ করার অর্থ, তার মর্ম্ম অনুভব করা। ঐ রসের সন্ধান একমাত্র অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়; অপরপক্ষে আমার মতে সঙ্গীতের ব্যাকরণ আছে, কিন্তু অভিধান নেই।

এর উত্তরে আমার কোনও সুগায়ক বন্ধু এই প্রশ্ন করেন যে, "তবে কি আপনি বলতে চান যে, সুর ও কথার ভিতর কোনও স্বাভাবিক যোগাযোগ নেই? আর বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মানুষে নিরবধি যে গান গেয়ে আসছে – তা কি সঙ্গীত নয়?"

এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জো নেই, সুতরাং এর উত্তর দেওয়াটা কর্ত্তব্য; এবং এ প্রবন্ধে আমি সেই কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করব।

কথা ও সুরের যোগাযোগটা এতই প্রত্যক্ষ যে, গান যে সঙ্গীতের একটা অঙ্গ, একথা অস্বীকার করা চলে না। অপরপক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, যন্ত্রসঙ্গীতে কথার বালাই নেই, অথচ যন্ত্রসঙ্গীতও

সঙ্গীত—শুধু তাই নয়, অনেক গানও যন্ত্রসঙ্গীতের সামিল। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী গানের কথার অর্থ আমরা বুঝি নে। সুতরাং মোটামুটি হিসেবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যে-বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী গান শুনে যথার্থ আনন্দ পান, তিনি তার সুরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন; আর যিনি বাঙ্গলা ছাড়া অপর কোনও গান শুনলে কাতর হয়ে পড়েন, তিনি বাংলা গানের কথার রস উপভোগ করেন। অর্থাৎ এর এক-জন হচ্ছেন সঙ্গীতরসের রসিক, আর একজন কাব্যরসের রসিক। এ উভয়ে অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। এঁরা এক দেশের অর্থাৎ ভাবরাজ্যের অধিবাসী হলেও, এক জাত নন। রবীন্দ্রনাথের রূপকের ভাষায় বল্‌তে গেলে, সুরপ্রাণ লোকের ঠিকানা হচ্ছে ১লা নম্বর, এবং কথাপ্রাণ লোকের ২রা নম্বর; এবং এ উভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের একের ভাষা অপরে বুঝতে পারে না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন সিতাংশু মৌলীও নই, অদ্বৈতচরণও নই—কিন্তু এ দুয়ের মধ্যস্থ জীব;—অর্থাৎ আমরা যখন উভয়ের আসরেই সমান আড্ডা জমাই, তখন আমাদের পক্ষে সুর ও কথার মিলনের রহস্য উদ্ঘাটন করবার অন্ততঃ চেষ্টা করাটাও দরকার।

(২)

প্রথমত, কথার দলের মত শোনা যাক্। অদ্বৈতচরণ বলেছেন :—
"ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল, তখনই গানের উৎপত্তি—

তখন মানুষ চিন্তা কর্‌তে পারত না বলে চীৎকার করত।" অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রকাশের আদিম চেষ্টার ফল কণ্ঠসঙ্গীত। শুন্‌তে পাই এ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। গান থেকে যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এ বৈজ্ঞানিক মত গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিন্তু অনেক বাধা আছে। গানের সৃষ্টি বোবায় করেছে, এ কথা বলাও যা,—আর নাচের সৃষ্টি খোঁড়ায় করেছে, এ কথা বলাও তাই। এরকম কথা বিজ্ঞানে বল্‌লেও, সজ্ঞানে, বলা যায় না। আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার ফলে বোবার কণ্ঠ হতে যে ধ্বনি নির্গত হয়, একালে আমরা তাকে সঙ্গীত বলি নে, সুতরাং সেকালের সেই জাতীয় ধ্বনিকে সঙ্গীত বলবার কোনই কারণ নেই। ব্যথায়, আহ্লাদে, আমরাও চীৎকার করি, কিন্তু সে চীৎকার-ধ্বনি সঙ্গীতের নয়, ভাষার অন্তর্ভূত—কেননা উক্ত উপায়ে আমরা কেবল সজোরে আমাদের মর্ম্মান্তিক ভাবই প্রকাশ করি। শুধু তাই নয়,—বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রস চীৎকারের সাহায্যে যেমন পুরোপূরিভাবে প্রকাশ করা যায়—কোনও কথার সাহায্যে তার সিকির সিকিও করা যায় না। চীৎকার সঙ্গীত নয়,—ও একরকম কথা; যেমন অনেক স্থলে কথাও একরকম চীৎকারবিশেষ। এর প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের মাসিক সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমালোচনাসাহিত্যে চীৎকার ব্যতীত আর বড় কিছু নেই। গান যে ভাষার আদিম রূপ নয়, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, যদি তা হত, তাহলে ভাষা তার স্বরূপ লাভ কর্‌বামাত্র গান বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে সঙ্গীত, ভাষার পাশাপাশি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি লাভ

করছে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সুর ও কথার ভিতর সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নয়।

(৩)

আমার বিশ্বাস, কথা ও সুর সহোদর—নাবালক অবস্থায় এ দুটী একান্নবর্ত্তী ছিল, সাবালক হয়ে উভয়ে পৃথক হয়ে গেছে। শব্দমাত্রই ধ্বনি, সুতরাং কথামাত্রেরই ঝোঁকও আছে, টানও আছে; অর্থাৎ প্রতি কথার অন্তরেই তাল ও সুরের উপাদান অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। সেই উপাদান কথা থেকে পৃথক করে নিয়ে, টানের বিস্তার ও সঞ্চার করে, এবং ঝোঁককে প্রস্ফুটিত ও গুম্ফিত করে মানুষে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। কথার ভিতর সুর, কিম্বা সুরের ভিতর কথা প্রক্ষিপ্ত করে, সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় নি।

(৪)

কণ্ঠসঙ্গীতই অবশ্য সঙ্গীতের আদিমরূপ। কেননা কণ্ঠ হচ্ছে মানুষের হাতেগড়া নয়, পড়ে-পাওয়া যন্ত্র। এবং সুর ও কথা দুই যখন ঐ এক যন্ত্রেই তৈরি হয়—তখন দুয়ের আদিম মিশ্রণটা নিতান্তই স্বাভাবিক, কেননা অনিবার্য্য। এ মিশ্রণ কিন্তু রাসায়নিক নয়—যান্ত্রিক। জীবজগতে এক শ্রেণীর জীব আছে, যারা একাধারে উদ্ভিদ ও জন্তু; গানও হচ্ছে আর্টের জগতে সেই শ্রেণীর পদার্থ—ও বস্তু একাধারে কাব্য ও সঙ্গীত। কিন্তু গানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতেও সুর ক্রমে ক্রমে কথার

বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আমাদের হিন্দুসঙ্গীতের ইতিহাসে সঙ্গীতের মুক্তির সোপানগুলি দিব্যি পর পর সাজানো আছে।

প্রথম আসে ধ্রুপদ। ধ্রুপদে কথা ও সুরের ভিতর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এ ক্ষেত্রে সুর ছাড়া কথাও নেই, কথা ছাড়া সুরও নেই।

তারপর আসে খেয়াল। খেয়ালে সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক নামমাত্র। এমন কি, এ ক্ষেত্রে কথা শুধু নামকো ওয়াস্তে—সুরই হচ্ছে সার। খেয়ালে সুর কথাকে পিছনে ফেলে নিজের খেয়ালে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এবং শ্রান্ত হলে কথার ঘরে বিশ্রাম করতে আসে মাত্র।

তারপর আসে আলাপ। আলাপে সুর কথার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না। সেইজন্যে আলাপের সুর কণ্ঠনিঃসৃত হলেও, যন্ত্র-সঙ্গীতের কোঠায় এসে পড়ে; এবং সেইজন্যে তা পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। বলা বাহুল্য, সঙ্গীত যন্ত্রস্থ হয়েই যথার্থ মোক্ষলাভ করে।

অপরপক্ষে ভাষা যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—তখন সে সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাব্য যত মহান্ হয়, ততই তা রাগরাগিণীনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। কাব্য যতদিন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারে, ততদিনই তা সুরের কোলে চড়ে বেড়ায়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সুর যে-পরিমাণে কথা থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে, এবং কথা যে পরিমাণে সুর থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা ভাষা হয়ে ওঠে। মুখে অর্থাৎ মূলে যা ছিল এক, কালক্রমে তা আর্টের অর্থাৎ মানুষের

আত্মপ্রকাশের রাজ্যে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বরের এক-দিকে চরম বিকাশ হচ্ছে অর্থমুক্ত আনন্দঘন যন্ত্রসঙ্গীত,—আর একদিকে চরম বিকাশ হচ্ছে সুরমুক্ত চিদ্‌ঘন কাব্যসাহিত্য।

কিন্তু চরম বিকাশ হলেও, এ উভয়েরি কৃত্রিম হয়ে পড়বার একটা বিশেষ সম্ভাবনা আছে। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সকল পদার্থই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কি সঙ্গীত, কি সাহিত্য, যখন শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে ওঠে—তখন তার অন্তরে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য আমাদের আবার মূলে ফিরে যাওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ সুর ও কথার পুনর্মিলন ঘটানো আবশ্যক। এই জন্যেই যুগে যুগে নতুন গান সৃষ্টি করা দরকার, নচেৎ কি সঙ্গীত, কি কাব্য, কোনটিকেই জিইয়ে রাখা যায় না। এক কথায় সঙ্গীতের স্থিতির জন্য সুর ও কথার যোগ, এবং তার উন্নতির জন্য ও-দুয়ের বিয়োগ আমাদের করতেই হবে। এ জগতের অনেক ক্ষেত্রেই পালায় পালায় এই রকম যোগ বিয়োগ ঘটে থাকে। প্রকৃতি যে গিঁট একবার খোলেন, কখন কখন তা আবার পাকা করে বাঁধেন। উদাহরণ—evolution of sex.

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙ্গলা-ভাষার কুলের খবর।

—:o:—

শুন্‌তে পাই এ দেশে এমন সব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক আজও আছেন, যাঁদের বিশ্বাস যে বাংলা-ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ।

এ বিশ্বাস যে অমূলক, বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা হওয়া দূরে থাক, দৌহিত্রীও নয়—কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের বংশধর—এ সত্যের যাঁরা প্রমাণ দেখতে চান, তাঁদের আমি গত আষাঢ় মাসের "প্রতিভা" পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের "বাঙ্গলা-ভাষা" নামক প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। চন্দ মহাশয়ের লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, যার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই, এমন কথা বলা তাঁর অভ্যাস নেই। এবং তিনি প্রাচীন দলিলপত্র হতে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। চন্দ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের হয়ে যে সকল গুণের দাবী করেছেন, যথা—"পরিশ্রম, রীতিমত বিচার, সহন, ধৈর্য্য" ইত্যাদি, তাঁর প্রবন্ধে সে-সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের সত্য নিজের অন্তরে আবিষ্কার কর্‌বার সহজ উপায়টি কোনও কোনও বাঙ্গালী ঐতিহাসিক আজও ত্যাগ করেন নি, সুতরাং তাঁদের আবিষ্কার তাঁদের মনঃপূত হলেও সকলের মনঃপূত হয় না। যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন না,—তাঁরা বাংলা-ভাষার

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়লাভে আনন্দিত হবেন; কেননা সংস্কৃতের অধীনতার চাপে বর্ত্তমানে বাংলা আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে—অথচ বাংলা-ভাষাকে শাসন করবার কোনও অধিকার সংস্কৃতের যে নেই—চন্দ মহাশয় এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন।

(২)

একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুকাল থেকে ভারতবর্ষের প্রাকৃতের চর্চ্চা করে আসছেন। এবং এঁদের অগাধ পরিশ্রমের ফলে এই সত্য আবিষ্কৃত হয় যে, মাগধী প্রাকৃত ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে কালক্রমে উড়িয়া, বাংলা ও আসামীরূপ ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেছে। কিন্তু বাংলা-ভাষা কোন যুগে তার বিশিষ্ট রূপ লাভ করে—তার প্রমাণ আমরা আজও পাই নি। এ ক্ষেত্রে দলিলপত্রের একান্ত অভাব। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে নেপাল থেকে কতক-গুলি বৌদ্ধ দোঁহা ও পদাবলী সংগ্রহ করে এনেছেন, যা নাকি তাঁর মতে হাজার বৎসরের আগেকার বাংলায় লেখা। অধ্যাপক বেণ্ডল এ ভাষাকে অজ্ঞাতকুলশীল ভাষা বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আমার কানেও এ ভাষার সুর কখনো বাংলা বলে ঠেকে নি। বহু শব্দের শেষে অযথা আকার সংযুক্ত থাকায়, এই সকল দোঁহা ও চর্য্যাপদের অধিকাংশ পদের চেহারা একটু খোট্টাই হয়ে উঠেছে। চন্দ মহাশয় বলেছেন যে—"এ ভাষা ত বাঙ্গলা নয়ই; ইহা হাজার বছর পূর্ব্বের বাঙ্গলার ভাষা অর্থাৎ প্রাচ্য অপভ্রংশ কিনা, তাহাও বলা কঠিন"। এ বিষয়ে কোনও কথা জোর করে বলবার অধিকার

আমার নেই। তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যে বাংলা, শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করতে পারেন নি;—বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত। দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন। আমার বিশ্বাস এই নামই ঠিক। এ ভাষা বাংলা-ভাষার উদয়ের ভাষা নয়—সম্ভবতঃ কোনও প্রাকৃতের অস্তের ভাষা। অপরপক্ষে এমনও হতে পারে যে, বাংলা ও হিন্দির সন্ধিতে এ ভাষার জন্ম। এ ভাষা যদি বাঙ্গলার প্রাচীন ভাষা হয়, তাহলেও এতে এতটা হিন্দির ভেজাল আছে যে, একে একটা দো-আঁসলা ভাষা বলাই নিরাপদ।

(৩)

"বাংলাভাষা" কথাটার ভিতর দ্ব্যর্থ আছে, কেননা এখন বাঙ্গলা-দেশে একটি নয়, দুটি ভাষার চলন আছে। এর একটি লেখার, আর একটি কথার ভাষা। আকারে প্রকারে এ দুয়ের ভিতর যে প্রভেদ আছে, সে কতকটা ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদের অনুরূপ। সাধু-ভাষার পাণ্ডাদের মতে, সরস্বতীর মন্দিরে খাঁটি বাংলার প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং বাংলাভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে—এই সাধুভাষার কুলের খবরও নেওয়া দরকার। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার (Senart) ভারতবর্ষে জাতিভেদের মুল আবিষ্কার করবার চেষ্টায় বিফল হয়ে, শেষটা হতাশ ভাবে এই কথা বলেন যে, "হিন্দুস্থানের আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে, যার গুণে এদেশে কোনও জিনিষই গোটা থাকে না—সবই টুকরো হয়ে পড়ে"।—এক কথায় এ দেশ হচ্ছে ভগ্নাংশের দেশ। চন্দ মহাশয় কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। যিনি

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি যে বাংলাভাষার জাতিভেদের কারণ নির্ণয় না করে ক্ষান্ত হবেন, এ হতেই পারে না। বিশেষতঃ এ প্রভেদের মূল যখন একালের ভিতরেই পাওয়া যায়। চন্দ মহাশয়ের মতে সেকালে এ দেশে একটিমাত্র ভাষা ছিল—যে ভাষাকে আমরা শূদ্র বলি ;—এই শূদ্র ভাষার অন্তর থেকেই ব্রাহ্মণ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং সাধুভাষা হচ্ছে বর্ণব্রাহ্মণ ভাষা। লেখার ভাষার, এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার মূলে আছে রাজপ্রসাদ। নবাবী আমলে গৌড়ের রাজ-দরবারে বাংলাভাষার উপনয়ন হয়, পরে ইংরাজি আমলে কলকাতার কেল্লায় তা পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। চন্দ মহাশয় তাই বলেন যে, এই "সাধুভাষাকে King's Bengalee বা রাজার বাংলা বলা যাইতে পারে।" এই প্রবন্ধেই চন্দ মহাশয় সাধুভাষাকে কোথায়ও "রাজভাষা" কোথায়ও বা "রাজার দুলালী" ভাষা বলেছেন। এর পরে আলালী ভাষার পক্ষে কোনও কথা বল্‌লে, সে কথা অবশ্য বিদ্রোহ বলেই গণ্য হবে। চন্দ মহাশয় তাই সাধুভাষার বিপক্ষ দলকে "বিদ্রোহী দল" বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর মতে এ "বিদ্রোহের প্রকৃত নায়ক স্যর রবীন্দ্রনাথ।" কেননা তিনি "গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বাংলা গদ্যে দেশী শব্দের ব্যবহারবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সাহস দেখাইয়াছেন"। কথা সত্য।

(৪)

চন্দ মহাশয়ের নির্ণীত সাধুভাষার নিদান যে ঠিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে হিসেবে ইংরাজি সাহিত্যের ইংরাজি

King's English সে হিসেবে সাধুভাষা King's Bengalee নয়;—কেননা এ ভাষা বাদশার আমলেও Court language ছিল না--ইংরাজের আমলেও তা হয় নি। খাঁটি বাংলার মত সাধু বাংলাও চিরদিন রাজদরবার থেকে তিরস্কৃত হয়ে রয়েছে। সাধুভাষা রাজার ফরমায়েসে তৈরি হলেও রাজভাষা নয়,—সংক্ষেপে সাধুভাষা কেতাবি হলেও খেতাবি নয়। চন্দ মহাশয় স্বীকার করেন যে, এ ভাষা একটা "কৃত্রিম" ভাষা। তাঁর নিজের কথা এই;—

"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের...........পণ্ডিত মহাশয়েরা, পণ্ডিত জনে পড়াইতে পারেন, এমন ভাষা গড়িয়া তুলিলেন। তদ্ভব ও দেশী শব্দ ভাষা হইতে তাড়িত হইল।.................এই বাংলা গদ্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে পড়িয়া, এমন কৃত্রিম বস্তুর যতটা সজীব, সরস ও সহজ হওয়া সম্ভব, ততটা তেমন হইয়াছিল।"

এই কথাই ত আমি চিরদিন বলে আসছি, সুতরাং আমার সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের গরমিলটা যে কোথায়, তা একটু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক। চন্দ মহাশয় বলেছেন:—

"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লেখ্যভাষার সংস্কারসম্বন্ধে বিদ্রোহীদলের অনুযায়ী দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব দুইটি এই......

(১) অনেক কথা যা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার লেখায় ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

(২) মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের ও বিভক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়।"

এ প্রস্তাব দুটি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় বলেন.....................

"প্রথম প্রস্তাবটি খুবই ভাল। এখন বাহিরে পড়িয়া আছে, এমন বাঙ্গলা কথা লেখ্য ভাষার ভিতরে টানিয়া আনিয়াই আমাদের থামিয়া যাওয়া ঠিক নয়। লেখ্যভাষার ভিতরে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি বাদ দিলে চলিতে পারে, সেইগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত"।—উদাহরণস্বরূপ তাঁর মতে "বহির্ভূত" শব্দটিকে বঙ্গ-সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করা দরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে চন্দ মহাশয় আমাকেও ছাড়িয়ে যান। আমি, কি তদ্ভব কি তৎসম, কোন শব্দকেই বয়কট করবার পক্ষপাতী নই। আমার মত এই যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দকে সাধুভাষীরা নির্ব্বিচারে বঙ্গ সাহিত্যে অবরুদ্ধ করেছেন, এখন তাদের কোন কোনটিকে মুক্তি দিতে হবে—কিন্তু সে বিচার করে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব তিনি অবশ্য গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন ধর্ম্মকর্ম্মের বদলে ধম্মকম্ম সাহিত্যে চলবে না। অবশ্য চলবে না, এবং আমরা তা চালাতেও চাই নে,—কেননা আমরা মুখেও বলি ধর্ম্মকর্ম্ম। যদি কোনও প্রদেশের মৌখিক ভাষায় ও-দুটি শব্দ রেফভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে প্রদেশের মৌখিক ভাষাও সাহিত্যে চলবে না। কিন্তু চন্দ মহাশয়ের আসল আপত্তি ক্রিয়াপদের প্রচলিত বিভক্তিতে। তিনি বলেন, "আসছি" হচ্ছে ক্রিয়ার synthetic আকার, আর "আসিতেছি" তার analytic আকার; এবং যেহেতু বাংলাভাষা analytic ভাষা, সেই কারণ "আসিতেছি" আকারই গ্রাহ্য। এ যুক্তি যদি সঙ্গত হয়, তাহলে "আসতে আছি" লেখাই কর্ত্তব্য—কেননা "আসিতেছির" অপেক্ষা "আসতে আছি" analytic

হিসেবে আর এক ধাপ উপরে। প্রদেশভেদে আজও বাঙ্গালীর মুখে "আসতে আছি" "আসিতেছি" এবং "আসছি", এই তিন রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং কথায়বার্ত্তায় এর শেষোক্ত রূপটিই যে আমাদের কানে ভাল লাগে ও ভদ্র শোনায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা যদি কানের পরামর্শ শুনি, তাহলে লেখায় "আসিতেছি"র পরিবর্ত্তে "আসছি" লিখতে কুণ্ঠিত হব না। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ইংরাজ-কবি মিলটনের যে মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তার একটি কথা আমি নতশিরে মেনে নিতে রাজি আছি। মিলটন বলেছেন, সাহিত্যের অন্তর থেকে বর্ব্বরতা দূর করবার জন্য "Detective police of ears"-এর প্রয়োজন। অলঙ্কারের সকল সমস্যা কেবলমাত্র নিরুক্ত ব্যাকরণের সাহায্যে মীমাংসা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষ করে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনও analytic ভাষা ষোল-আনা analytic নয়, কিন্তু অনেকাংশে বিভক্তিগত, অর্থাৎ synthetic.

(৫)

বাংলা পদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় যা বলেছেন তা সত্য হলেও, উক্ত সাহিত্যের ভাষার প্রতি "সাধু" বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না,—ও গুণ হচ্ছে কলকাতার কেল্লাজাত গদ্যের একচেটে। কৃত্তিবাসী রামায়ণাদি গৌড়ের মুসলমান বাদশাদের আদেশে রচিত হলেও কোনও দরবারি ভাষায় রচিত হয় নি; খাঁটি বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এরূপ হবার কারণ চন্দ মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেন:—

"ইংরেজ আমল আরম্ভ হইলে ইংরেজ রাজপুরুষগণকে বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য গদ্যপুস্তকের দরকার হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পুরাণ গদ্যপুস্তক তখন ছিল না, যাহা সাহেবদিগকে পড়ান যাইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য তৈয়ারি করার ভার পড়িল। কৃত্তিবাস, গুণরাজখান, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের গীত সাধারণ অশিক্ষিত লোকের জন্য রচিত হইয়াছিল।"

চন্দ মহাশয়ের উপরোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।—এ স্থলে অশিক্ষিত শব্দ সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের প্রতিই ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং গৌড়ের পাঠান বাদশাদেরও নির্ভয়ে অশিক্ষিতের দলে ফেলা যেতে পারে। তাঁরা আরবি ফার্সিতে সুপণ্ডিত হলেও, নিশ্চয়ই সংস্কৃত জান্‌তেন না; নচেৎ সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁরা অতটা লালায়িত হতেন না। ফোর্ট উইলিয়ামের সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের একটি বিশেষ তফাৎ এই ছিল যে, সাহেবেরা বাংলা জানতেন না, বাদশারা জানতেন। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ রাজপুরুষদের বাংলা শেখাবার জন্য নয়, কাব্যকথা শোনাবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন,—কাজেই সে সব গ্রন্থ খাঁটি বাংলাতেই রচিত হয়েছে।—

চন্দ মহাশয় নবাবী আমলের পদ্যকে যে সাধু আখ্যা দেন, তার একমাত্র কারণ যে, বর্ত্তমান সাধু গদ্যের সঙ্গে সে পদ্যের এক জায়গায় মিল আছে। ক্রিয়ার অন্তে "ইয়া" এবং সর্ব্বনামের অন্তরে "হা" একালের গদ্যে আছে, এবং সেকালের পদ্যেও ছিল। বলা বাহুল্য ভাষা সম্বন্ধে সাধু শব্দের অর্থ হচ্ছে কেতাবি। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একালে ক্রিয়ার যে রূপ কেতাবি হয়ে উঠেছে, সেকালে সে

রূপ যে মৌখিক ছিল না, তার প্রমাণ কি? সেকালে তাঁরা যদি মুখে "করিয়া" না বল্‌তেন, তাহলে লেখায় ও রূপ কোথা থেকে আমদানি কর্‌লেন? একালে আমরা এ রূপের সন্ধান বইয়ের ভিতর পাই, কিন্তু বাংলার আদি কবিরা ত আর বাংলা বই পড়ে বাংলা বই লেখেন নি। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সেকালের উচ্চারণের অনুরূপই বাংলা লিখে গিয়েছেন। বিশেষ্য ও বিশেষণের বেলায় তদ্ভবের পরিবর্ত্তে তৎসম শব্দ ব্যবহার করায় কোন বাধা ছিল না—কেননা সংস্কৃত অভিধানের মধ্যেই সে শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; কিন্তু ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সাধুবিভক্তির সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিতর পাওয়া যায় না।—সুতরাং আমরা যখন "করে" লিখি, তখন বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করি। চন্দ মহাশয় সাধুভাষার পক্ষে ওকালতি কর্‌তে বসেন নি—তিনি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন; সুতরাং তিনি ভাষাসম্বন্ধে কোনও সত্যের সাক্ষাৎ পেলে, অকপটচিত্তে তা সকলের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই:—

"যদাদি সর্ব্বনামের যাহাকে যাহাতে ইত্যাদি রূপ; ইয়া, ইতেছি ইত্যাদি ক্রিয়ার বিভক্তি, অবশ্যই কথ্যভাষা ঝাড়িয়া পুছিয়াই সংগ্রহ করা হইয়াছিল।"—উক্ত বাক্যটি থেকে "ঝাড়িয়া পুছিয়া" পদ দুটি বাদ দিলে, আমার কথার সঙ্গে তাঁর কথার তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। চন্দ মহাশয় আরও বলেন যে "এই সকল বিভক্তি যে কোন্ প্রদেশের কথ্যভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বলা সহজ নহে";—আমার বিশ্বাস তা বলা মোটেই কঠিন নয়। গঙ্গা যেমন বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করামাত্র দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে, একদিকে পদ্মা আর একদিকে

ভাগীরথীর আকারে বয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাও তেমনি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। মাহাত্ম্য যেমন পদ্মার জলে নেই, ভাগীরথীর জলে আছে,—তেমনি ভাগীরথীর উভয়কূলের বাংলা ভাষায় যে মাহাত্ম্য আছে, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সে মাহাত্ম্য নেই। এই ভাগীরথী-ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা। আমরা যে ইংরাজি আমলের কেতাবি ভাষার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি, তার কারণ—আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতার কেল্লার গড়খাইয়ের বদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তরে আবার ভাগীরথীর প্রবাহ এনে ফেলা। এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, সে জল ঘোলা—তার উত্তরে আমরা বলব তা হোক, ওতে স্রোত আছে।—কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই ভাগীরথীভাষাই হচ্ছে আমাদের যথার্থ জীবন, এর স্নানপানেই আমরা কৃতার্থ হব। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে লর্ড মরলির একটী মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলি বলেছেন যে, বর্ত্তমান ইংরাজি সাহিত্যে :—

"Domestic slang, scientific slang, pseudo-aesthetic affectations, hideous importations from American newspapers" প্রভৃতি প্রবেশ করে, সে সাহিত্যের শুদ্ধতা ও আভিজাত্য নষ্ট করছে। বাঙ্গলার সাধু গদ্যের বিরুদ্ধে আমাদেরও ঐ একই অভিযোগ। বিদ্যে-দেখানো পণ্ডিতি slang, সৌন্দর্য্যের ওজুহাতে pseudo-aesthetic অর্থাৎ pseudo-classical affectations, ইংরেজি-ভাঙ্গা বীভৎস সঙ্কীর্ণবর্ণ নবশব্দ প্রভৃতির আমদানিতে বাঙ্গলার সাধুগদ্য কিম্ভূতকিমাকার ও জবড়জঙ্গ হয়ে উঠেছে।—চন্দ মহাশয়ের বিশ্বাস যে, আমরা সাহিত্যের ভাষা থেকে ঐ সব পাপ দূর করে, তার পরিবর্ত্তে domestic slang-এর আমদানি করতে চাই। তিনি

ভুলে গিয়েছেন যে, আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার করতে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোনও শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে পারি নে। Slang, ভাষা নয়; হয় তা অপভাষা, নয় উপভাষা। ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি-ভাবে ব্যবহার করতে চাই।—ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, তা চন্দ মহাশয়ধৃত বাগ্‌ভটালঙ্কারের একটি বচনে বেশ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।—

"অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম"

অর্থাৎ "সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ।"—

চন্দ মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা একটী অপভ্রংশ; সুতরাং কথিত ভাষা যে শুদ্ধ বাংলা—এ কথা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং এই ভাষাই যে সাহিত্যে প্রযুজ্য, সে সম্বন্ধে তিনি ভরত মুনির বিধিও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। সে বিধি এই:—

বিন্ধ্যসাগর-মধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
ন-কার বহুলা তেষু ভাষা তজ্জ্ঞঃ প্রয়োজয়েৎ॥—

আমরা এই শাস্ত্রবিধি পালন করবার চেষ্টা করে থাকি। আমাদের এ প্রচেষ্টা যে শুধু শাস্ত্রসঙ্গত তাই নয়—যুক্তিসঙ্গতও বটে। চন্দ মহাশয় এই বলে তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন:—

"খাঁটি বাঙ্গলা শিক্ষা করা আবশ্যক"।—আমরা বলি শুধু শিক্ষা নয়, এ বিষয়ে দীক্ষা নেওয়াও আবশ্যক।—চন্দ মহাশয় সাহিত্যের

ভাষা সম্বন্ধে লর্ড মরলির মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলির চাইতে ঢের বড় লেখক—নব্য ইতালির সর্ব্বপ্রধান কবি ও গদ্যলেখক Carducci-র মত আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। Bologna বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করে Carducci তাঁর শেষ বয়সে এই কটি কথা বলেন।ঃ—

"It has been my wish always to inspire myself and lift you up to the attainment of this ideal—to shed the old garments of an outworn state of society, and to prefer being to seeming, duty to pleasure; to aim high in art, I say; at simplicity rather than artifice; at grace rather than mannerism; at vigour rather than display; at truth and justice rather than glory."—

আমাদের সরস্বতীর মন্দিরের সিংহদ্বারের উপরে এই কটি কথা যে সোণার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস চন্দ মহাশয় আমার সঙ্গে একমত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অহল্যা।

—:০:—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥

উক্ত বিধির অর্থ ও অভিপ্রায় নিয়ে বহু শিক্ষিত লোক যে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ইংরাজি শিক্ষার গুণ কিম্বা দোষই এই যে, তা মানুষকে মানুষের সকল কথা, সকল কাজের মানে বুঝতে ও কারণ খুঁজতে শেখায়; এবং বলা বাহুল্য যে উক্ত বিধির মর্ম্ম ও ধর্ম্ম এতটা প্রত্যক্ষ নয় যে, বিনা অনুসন্ধানে বিনা গবেষণায় তা হস্তগত করা যায়।

কিন্তু অনেক মাথা বকিয়েও, স্মৃতিশক্তির উক্তরূপ চর্চ্চার সার্থকতা,—এক কথায় এ বিধির বৈধতা—কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি। এর প্রথম কারণ, বুদ্ধির ছুরিতে চিরে দেখলে দেখা যায় যে, অনেক বিধিরই অন্তরে কোনও সার নেই। এর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই বিধিটি এতই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া যে এর কাছ থেকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ঘা খেয়ে এবং বিচারবুদ্ধি হার মেনে চলে আসে। সাদার গালে কালি দিয়ে তাকে কালো করা যত সহজ, কালোর গালে চুন দিয়ে তাকে সাদা করা তত সহজ নয়। সে চূর্ণ যে ছুঁলে মুছে যায়, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

এ বিধির অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একদম বাজে খাটুনি ;—কেননা আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনও পৈতৃক আধ্যাত্মিক গুপ্ত ধন পোঁতা নেই। যে দেশে সীতা সাবিত্রী চিরস্মরণীয়া, সেই দেশেই যে আবার তারা মন্দোদরী নিত্যস্মরণীয়া—এ কথা এতই অদ্ভুত যে, উক্ত শ্লোকটি উদ্ভট না হয়ে যায় না। ও হচ্ছে আসলে একটা রসিকতা—এবং বেজায় রসিকতা।

রসিকতাকে যে লোকে হয় অসার কথা নয়, সার কথা বলে ভুল করে, তার পরিচয় ত একালেও সকালে বিকেলে পাওয়া যায়। সেকালের তাঁরা একালের আমাদের চাইতে যখন ঢের বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তখন সেকালের রসিকতা যে কালগুণে শাস্ত্রবিধি হয়ে উঠবে, তাতে আর আটক কি ?

(২)

এককালের রসিকতা যে আর এককালে বিধি হিসেবে গণ্য হতে পারে, একথা অনেকে মানলেও,—একথা সকলে মানবেন না যে, এককালের বিধি আর এক কালে রসিকতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। যার কোনও কারণ নেই, মীমাংসক মতে সেই বিধিই যে একমাত্র পাকা বিধি, এ কথা কে না জানে ?—সুতরাং উক্ত নিয়মানুসারে এ বচনকে পাকা বিধি বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হলেও, এর একটা কথায় মনের মধ্যে একটু খট্‌কা রয়ে যায়।

কথাটা হচ্ছে এই যে, অহল্যাকে দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীর দলে কেন ফেলা হল ? এঁরা হচ্ছেন সব রাজার মেয়ে, রাজার রাণী,

সব এক জাত, এক দল। অপরপক্ষে অহল্যা ছিলেন একে ব্রাহ্মণ-কন্যা, তাতে ঋষিপত্নী; অপর চারটির সঙ্গে তিনি ত এক কেলাসে বসতেই পারেন না।

কথায় বলে, "রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়।"

সুতরাং ইহজীবনে উক্ত রাজার নন্দিনীরা যে যা করেছিলেন, সে সবই যে শোভা পেয়েছিল,—তার সাক্ষী ব্যাস ও বাল্মীকি। এই রাজার ঝিরা আখেরে রাজার প্যারী হয়েই ভবলীলা সম্বরণ করে' স্বর্গে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদী অবশ্য স্বর্গের সকল সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন নি, তার কারণ তিনি হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে সমান করে দেখেন নি। সশরীরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল শুধু বেচারি ব্রাহ্মণকন্যাকে; আর সে প্রায়-শ্চিত্ত কি ভয়ানক কাণ্ড—দেহ হয়ে গেল পাষাণ, আর তার ভিতর আত্মা রইল কবরস্থ। নিজের ভিতর নিজের গোর হওয়াটা কখনই আরামের হতে পারে না,—হোক না সে সমাধি-মন্দির মার্বেল পাথরে গড়া। অথচ কি অপরাধে তাঁকে এই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল?—অহল্যার অপরাধ এই যে, তিনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকে স্বামী বলে ভুল করেছিলেন। স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করায় যে পুণ্য হয়, এ কথা ত এদেশের স্ত্রীলোকেও জানে; অথচ এ কথা এ দেশের পুরুষেও মানে যে, অধিকাংশ স্ত্রীর পক্ষে অধিকাংশ স্বামীকে দেবতা বলে ভুল করবার কোনও কারণ নেই,—অতএব সে ভুল করাও অসম্ভব। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, যে ভুল করা অসম্ভব সেই ভুল করায় হয় মহাপুণ্য,—আর যে ভুল না করা অসম্ভব, সেই ভুল করায় হয় মহাপাপ। দর্শনে বলে এ জগৎটা একটা ভ্রান্তি মাত্র।

জীবনের গোড়ার অঙ্কই যখন ভুল, তখন তার ভুলের অঙ্ক যত বাড়ানো যাবে জীবনটা যে তত বড় হয়ে উঠবে—এ ত ধরা কথা। এই কারণেই সামাজিক পিনাল কোডের ধারাগুলি মুখস্থ করেই লোকে জীবনে পাশ হয়,—বুঝলে পরে নির্ঘাত ফেল।

(৩)

অতএব ধরে নেওয়া যাক্ যে, অহল্যা তার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই ভোগ করেছিল।

তারপর এই প্রশ্ন ওঠে যে, একবার যে পাষাণী হয়েছিল, তাকে আবার মানবী করারূপ দ্বিতীয়বার শাস্তি দেবার কি সঙ্গত কারণ ছিল। মানুষকে যখন মরতেই হবে, তখন একবার এবং একেবারে মরাই ভাল। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা বেঁচে উঠে আবার যে-কি-সেই হয়েছিলেন,—অমরত্ব লাভ করেন নি। রামায়ণে শুধু এক ব্যক্তি অমর হন; এবং তাঁর নাম বিভীষণ—এরূপ হবার কারণ এই যে, পৃথিবীতে অমরত্ব একটা বিভীষিকা মাত্র। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অহল্যা বেচারিকে দোকবু ভবযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে, রামচন্দ্র তাঁর বিশেষ কোন উপকার করেন নি; মাঝ থেকে দেশের একটি মহা ক্ষতি করে গিয়েছেন। পাষাণী অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণের সঞ্জীবনী-স্পর্শ না পেলে, এদেশে এমন একটি Statue থেকে যেত, যার রূপের তুলনা মর্ত্ত্যে ত দূরে থাক অমরাপুরীতেও নেই। তাহলে গ্রীসের দেবীমূর্ত্তির উপর ভারতবর্ষের মানবীমূর্ত্তি টেক্কা দিতে পারত। শুধু তাই নয়—আর্ট realistic কি idealistic—এ পণ্ডিতী তর্কটাও

উঠত না। কেননা আমরা ঐ নমুনা চোখের সুমুখে রেখে সেই আর্টের চর্চ্চা করতুম—যা একাধারে ও দুইই। যা পরম সুন্দর তা যে ভগবানের সৃষ্টি,—এই পরম সত্যের সাক্ষাৎ আমরা চর্ম্ম-চক্ষেই লাভ করতে পারতুম।

৩০শে বৈশাখ।

বীরবল।

দুখানি চিঠি।

——:০:——
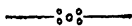
(চিঠি লেখাটা একালের এবং বিশেষ করে ইউরোপের সামাজিক রীতি। এর কারণও স্পষ্ট ;—পোষ্ট আফিসের সৃষ্টির পূর্ব্বে একখানি চিঠি পাঠাতে যে অর্থ-ব্যয় হত, তাতে একালে ইহজীবনের মত ডাকটিকিট কেনা যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য খুঁজেপেতে আমি দুখানি মাত্র "লেখ্যর" সন্ধান পেয়েছি। একখানি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে, আর একখানি দামোদর গুপ্তের এমন একখানি স্বনামধন্য কাব্যে, যার নাম উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বারান্তরে এই চিঠি দুখানি সায় বঙ্গানুবাদ পাঠক সমাজের নিকট পেশ করব। এই নমুনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেকালে চিঠি লেখা ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপেই সারা হত,—সম্ভবতঃ এই কারণে যে, সে যুগে কাগজেরও বিশেষ অনটন ছিল।

এই পোষ্ট আপিসের যুগেই চিঠি লেখাটা যে সর্ব্বসাধারণের বস্তু হয়েছে, শুধু তাই নয়—কারও কারও হাতে তা একটা বিশেষ আর্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপের অনেক বড় লেখকের চিঠি সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজ কবি Byron, জর্ম্মাণ কবি Heine, এবং ফরাসি নভেলিষ্ট Flaubert-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আসন এঁদের কারও চাইতে নীচে নয়। এই বিশ্বাসের বলেই আমি তাঁর বহুকাল-পূর্ব্বে লেখা দুখানি চিঠি প্রকাশ করছি। বলা বাহুল্য এ ধরণের চিঠি ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা হলেও তা সাধারণের সম্পত্তি। এ চিঠি দুখানির একটু বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের "ছবি ও গান" ও "মেঘদূত" কি অবস্থায় ও কি মনোভাব থেকে লিখিত, এই চিঠি দুটিতে পাঠক তার পরিচয় পাবেন।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।)

(১)

শান্তিনিকেতন
বোলপুর।
২১ মে, ১৮৯০।

প্রমথ

আমি কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকালবেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস-পাইপ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয়—কতকটা সেইরকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে, এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়; কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয়, তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না, কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিস। কেবল কথোপকথন নয়,—খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এইরকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ করে' অল্প মূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে, এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জন সুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে—কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায়, কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করে না। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার কোন আবশ্যক ছিল না—কিন্তু উপমাটা নাকি এল, সেই জন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল—অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আঁতা উস্‌কো আনে দেও!"

তোমার সম্বন্ধে যা বলবার, অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরেনা ;—সংক্ষেপে, তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল—হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম ; তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকা-বকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে, চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না,—সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে ; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়—অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয়, সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আসতে পার, তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘটতে পারবে। এখানে বই বহুবিধ আছে ; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। এখেনে গদি-দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বসবার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোনরকম ব্যাঘাত ঘটবে না। তুমি চুয়োডাঙ্গার যেরকম বর্ণনা করেছ, তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভুগোলের" অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধূ ধূ করচে—মাঝে মাঝে এক একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন—মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে—মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘন বনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে

আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে এক একটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ—মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে, কালো হয়ে, কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মত বেরিয়ে রয়েছে। উত্তর দিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে—সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুকরো ও কাঁকরে আবৃত—তাতে ছোট ছোট বুনো জাম, বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরল ভাবে শোভা পাচ্চে—তারি মধ্যে মধ্যে ঝরনা এবং জল-স্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়—শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের-অন্তরাল-হতে-দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসা-দের দ্বারা মুকুটিত হয়ে, নিভৃত মহিমায় বিরাজ করচে। এই বোল-পুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাল লাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে

পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্চি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধহয় এ রকম অবস্থা হয়—

"উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
　　ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
　　রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বলতে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে—তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep-delved 'heart'.

আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা' প্রবল, না 'সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যা-

ত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী ; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelley-র Skylark, আর একটা হচ্চে Wordsworthএর Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার, এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে,—অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে)—পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে, এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেই ভাল হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না, এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ—"আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে

অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত—যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আস্‌চে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্‌। আজকাল একটু আধটু লিখতে আরম্ভ করেছি—কাছে থাক্‌লে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

২৪ মে, ১৮৯০।

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজ্‌বুৎ ভারিগোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম—ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল—এখন শরীরমন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়—বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ডভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে

হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধূলো,—শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তুপাকার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে, অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে—তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে—সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে—কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি—সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুর্‌পাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান—ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্যরীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারে না, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এ রকম অশিষ্টাচরণ সত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বারগৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে—কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে—অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না—এই

জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপ-গ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপন করে বিচিত্র নদী, পর্ব্বত, বন, গ্রাম, নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়—সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে—সেইখানে চরম বিশ্রাম—সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাকলে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই—রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতা-সুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে, রীতিমত Oriental রাজ-মাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক্" হয় না—একটা দক্ষিণে ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হত—কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বদ্ধ হয়ে আছি—মনটা উদাস হয়ে আছে,—আমাদের একবার মেঘের মত মস্ত স্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্ত! আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্চে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না—তবু ও আমি বদ্ধ হয়ে আছি, ছুটি পাচ্চি নে! আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়—আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই—সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য

আজকের এই মহা দুর্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে—আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায়, মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আসতুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুনলেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল, এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;—চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নব বর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে, এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জের ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে—দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে—সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুলতে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে—রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে, সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল, তাহলে এ সব দেশ না দেখে কি যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল, তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত—যক্ষ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর হয়, তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিক্ সম্প্রদায় থাকৃত, তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত—তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি

ক্রিটিক্‌দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি, যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্, আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে—ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বল্‌চি, dramatic হয় নি,—কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে—যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল, সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশ দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস কর্‌ত, তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল্—এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্ত্তী ষ্টেষনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল—এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয় নি—কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন, তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বল্‌তে পারি আমি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়—এমন কি প্রণয়িণী কাছে থাক্‌লেও হয়—কবি নিজেই লিখেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িণীজনে, কিং পুনর্দূর সংস্থে!"

অর্থাৎ মেঘলা দিনে প্রণয়িণী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়—দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে ঐই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে—কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে

হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্য্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে, অন্ধকার হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারি নে। পোস্ট অফিস এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই—তাই জন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে, আর্দ্র তন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকেন না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে, মুড়ে, টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, তার পরে নিশ্চিন্ত মনেস্নানাহার করেন। এমন কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিশের বন্দোবস্ত হয় নি, তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল—তাই

"প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না!"—

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে করোনা আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে, চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্ অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্ অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে, যখন মেঘদূত বা কোন প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি—তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহশয়ানে বিলীন হয়ে থাকে, এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি—তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্, বিদেশেই থাক্, এবং ভালবাসা যেমনই থাক্—

সকলেই বেশ comfortably কাল যাপন করচে, এটা কিরকম গল্পোপযোগী শোনায়!—বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে—বাতাস বচ্চে, এবং সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আস্‌চে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি—দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি—চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না—কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে, এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হচ্চে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধূ ধূ করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম দশা; সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য লক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তারি স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,—প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন—তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দ—সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়—বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না।—তাই আশঙ্কা হচ্চে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়।

চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্চে ঐ—বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধ্যের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়—উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জ্বেলে একলা বসে যে চিঠিটা লেখা হয়, সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর, তাহলে কিরকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—চুরি ক'রে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয়, এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানের" কথা আছে—বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে-সকল কবিতা লিখচি, তা' "ছবি ও গান" থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন্ চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা ত পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁকবে না—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্ম-বিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্ট কাল বেঁচে থাকি, তাহলে এমন

একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে, এবং তাদের ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে—অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল—কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই—এতটি জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর, সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়—এর কথা আর শেষ হয় না—অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

* * * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন ও পুরাতন।

—:*:—
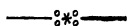
আজ যেটাকে আমরা পুরাতন বল্‌ছি এমন একদিন গিয়েছে যখন সেটা নতুনের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তরুণের বুকে বুকে পুলক সঞ্চার করে' গিয়েছিল—আর আজ যেটাকে আমরা নতুন বল্‌ছি এমন একদিন আস্‌বে যখন সেটাকে আপনা-আপনি পুরাতনের জীর্ণকন্থার অন্তরালে ধীরে ধীরে লুকিয়ে যেতে হবে। তাই আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি পুরাতন খালি পুরাতনই নয়—নতুনও খালি নতুনই নয়। পুরাতনের সার্থকতা নূতনেই আর নূতনের জন্ম পুরাতনেই। এই সত্য দেখ্‌তে পাচ্ছি বলেই, আজ আমরা নতুনকে আলিঙ্গন কর্‌তে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত নই। যে ক্রমাগত যুগ যুগ ধরে' আমাদের দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে আমাদেরও তার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে নইলে আমাদের সত্যিকার মিলন কিছুতেই হবে না। তাই আমরা আজ নতুনেরই হাত ধরে', বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে যে বিদ্যুৎ ছুটছে, হৃদয়ের তলে তলে যে রক্তধারা বইছে তারি তালে তালে চল্‌ব। এ নতুন যে আমাদের সেই পুরাতনেরই দান। এ দান অগ্রাহ্য করে' পুরাতনের অপমান কর্‌তে আমরা পার্‌ব না।

এই নতুনকে যারা অগ্রাহ্য কর্‌বে তারা নিজেকেই অগ্রাহ্য কর্‌বে—আর যারা নিজেকে অগ্রাহ্য কর্‌বে তারা অপরের দ্বারা গ্রাহ্য হবে না, নিশ্চয়। তাঁদের দিকে তাকিয়ে সবার আগে হাস্‌বে সেই

পুরাতন যাকে তারা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল। পুরাতনকে সনাতন করে' যারা জীবন কাটাতে চাইবে তাদের জীবন কাট্‌বে বটে কিন্তু তাদের মহত্ত্ব কোন দিনই ফুট্‌বে না। আর তাদের ঘরে লক্ষ্মীই হ'ন সরস্বতীই হ'ন কোন দিনই আস্‌বেন না। কারণ দেবদেবীদের সবারই চিরযৌবন। তাঁরা আসেন সেইখানে যেখানে তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ দিয়ে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। আর তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ নতুনের মধ্যেই আছে। পুরাতনের মধ্যে যা আছে সেটা প্রাণের আনন্দ নয় সেটা হচ্ছে প্রাণের আরাম। আর আরাম জিনিসটা আনন্দের ঠিক উল্টো দিক।

পুরাতনই যে সনাতন নয়—বরং সনাতন, পুরাতন ও নূতন এ দুটোকে নিয়ে—এ যারা বুঝ্‌বে জগতে জয় হবে তাদের। আর যারা পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে "অচলায়তন" গড়ে' তুল্‌বে তারা মানুষের অমর্য্যাদা কর্‌বে, এ-সৃষ্টির অমর্য্যাদা কর্‌বে—তাদের ভাগ্যে যা মিল্‌বে সেটা ইহলোকেরও ভুক্তি নয়, পরকালেরও মুক্তি নয়। কারণ ভুক্তি ও মুক্তি এ দুটোই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে।

আজ যে আমরা পিছনে পড়ে আছি তা আমরা, নতুনের সঙ্গে পা ফেলে' ফেলে' চল্‌তে পারি নি বলে, নতুনের ডাক শুনি নি বলে'। পুরতনেরই গায়ে সিঁদূর চন্দন ঘসে' ঘসে' তাকে আমরা উজ্জ্বল করে' রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি—সে পুরাতনের ভিতর থেকে যে কখন প্রাণ বেরিয়ে গিয়ে সেটা ধীরে ধীরে "মাম্মিতে" পরিণত হয়েছে তা আমাদের চোখেই পড়ে নি। পুরাতনকে সনাতন করে' আমরা মনুষ্যত্বকে আয়ত্ত্ব কর্‌বার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পুরাতনের অত্যাচারে, পচা সিঁদূর আর চন্দনের গন্ধে "মানুষ" যে কখন আমাদের ভিতর

থেকে বেরিয়ে পড়ে' কোথায় চম্পট দিয়েছে তা আমাদের লক্ষ্যেই আসে নি। আমরা মনে করেছি—বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে, সনাতনত্বের বাতিটা আমরাই ঠিক জ্বালিয়ে বসে' আছি।

এই নূতনের বার্ত্তা যেখানে যেখানে মান পায় নি সেখানে সেখানেই মানুষের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অপমান। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বড় বড় উদাহরণ আছে। আমরাও যদি এই নতুনের বার্ত্তা না শুনি, এই নতুনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে' চল্‌তে না শিখি তবে এমন একদিন আস্‌বে যখন আমরা জাতিকে—জাতি এ ধরাধাম থেকে চলে যাব—আর সেটা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে' নয়—সজ্ঞান-দুঃখ ভোগ করে' করে'।

যারা নতুনের মধ্যে কোন সত্যেরই সন্ধান পেয়ে ওঠে না তারা যে এ জগৎটাকে অসত্য বলেই ঘোষণা কর্‌বে তা'তে আর বিচিত্র কি? কারণ তাদের কাছে সত্য আর কোথাও নেই, শুধু এক শূন্যে ছাড়া। যেহেতু শূন্যেরই কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর যারা শূন্যেই তাদের সব সত্য প্রতিষ্ঠা করে' বসে' আছে তাদের যে এ জগতে লাভের ঘরে চারিদিক থেকে খালি শূন্যই জমা হবে সেটা নিতান্তই ন্যায় বিচার। তাদের কথায়, আচারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মর্ম্মে শুধু সেই শূন্যই রকমফের হ'য়ে ফিরবে। এই শূন্যকে পুঁজি করে' কোন জাত কোন দিন বড় হ'তে পারে নি। আর গণিতশাস্ত্রের এ কথাটা ত সবারই জানা আছে যে যত কোটীই হোক্ না কেন তাকে শূন্য দিয়ে গুণ কর্‌লে তার যা গুণফল হয় সেটা শুধু শূন্য।

নূতনের মধ্যে আমরা কোন সত্যকে দেখি নে বলে' আমরা শৈশবকে হাস্‌তে দিই নে কৈশোরকে খেল্‌তে দিই নে, যৌবনকে

চঞ্চল হ'তে দিই নে। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্যেই যে চঞ্চলা বসে' আছেন জগতের ইতিহাসে এটা এ পর্য্যন্ত কোথাও অপ্রমাণিত হয় নি। শিশুর মুখের হাসি শুখিয়ে উঠ্‌লে, কৈশরের বুকের নৃত্য থামিয়ে দিলে, যৌবনটা অচঞ্চল হ'তে বাধ্য। কিন্তু সে অচঞ্চলতা বিরাটও নয় স্বরাটও নয়। সে অচঞ্চলতা হচ্ছে আনন্দহীনের, প্রাণহীনের—সুতরাং অক্ষমতার। আমরা যে শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা পুরাতনের খোলস্ পরিয়ে দিই, সেটা শিশু যৌবনে পোঁছিলে তার গায়ে এমনি করে এঁটে বসে, যে তা'তে মরণ-পথের যাত্রীর যতই সুবিধে হোক্ না কেন জীবন-পথের যাত্রীর পক্ষে সেটা মস্ত অবিচার। যৌবনে যে আনন্দহাসি প্রাণে প্রাণে খেল্‌ছে তা খসিয়ে নিয়ে মানুষকে বার্দ্ধক্যের আরাম-প্রয়াসী করে' তুল্‌লে এ জগতের কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা ত তাকে পীড়া দেবেই—এবং বিশ্বব্যাপী এই বিরাট লীলা তার চোখে অসত্যই হ'য়ে উঠ্‌বে, আর নির্ব্বাণ মুক্তি-টাই যে আকাঙ্খ্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা আমরা চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু সবার চেয়ে আশার কথা হচ্ছে এই যে, জগতের ইতিহাসে নতুনের পরাজয় কোন খানে হয় নি—আর সেই নতুনের ডাক আজ বাংলা দেশে এসেছে। এই নতুনের ডাকে বাংলাকে সাড়া দিতেই হবে—কারণ নতুনের যে শক্তি তার মধ্যে গতি আছে আর জীবন্ত মানুষ গতিই চায়। আর গতিশীল মানুষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। যদি বা কোন ক্ষতি হয় তবে সেটাকে গতির বেগে একদিন—না—একদিন ভেসে যেতেই হবে—কিছুতেই চিরকাল টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই আমরা গতির এত *পক্ষপাতী। গতির*

খাতায় মানুষের লাভ-লোকসানের জমা-খরচে কখনও ফাজিল দাঁড়ায় না।

তবুও পিছনে পড়ে' থাক্‌বার জন্যেই যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা থাক্। তাদের টেনে চল্‌তে গেলে রাস্তার ভারই বাড়বে, গতির বেগ বাড়্‌বে না কিছুতেই। বিশেষতঃ এই যে পিছনের টান—এই যে পুরাতনের শক্তি তা আপনার অজ্ঞাতসারে নতুনকে অগ্রসর করে' দেওয়ার এত সাহায্য করে' যে আর কিছুতেই তেমন করে না। গান কর্‌তে কর্‌তে যেমন গলা খোলে, বিপরীত শক্তিকে পরাভূত কর্‌তে কর্‌তে তেমনি শক্তি খোলে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পুরাতন যেরকম বাধা বলেই মনে হোক্ না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে নতুনকে সাহায্য করেই চলেছে। সুতরাং পুরাতনের যে শক্তি তা থাকা শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, তা অত্যন্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

প্রথমে এই নতুনকে অল্পকয়েকজনই আলিঙ্গন কর্‌বে। কারণ প্রথম প্রথম নতুনের যে শক্তি তাতে ভার চাই নে—তাতে চাই ধার। নতুন বোঝা নয়। সে ভার দিয়ে পুরাতনকে চেপে রাখ্‌তে চায় না। সে চায় ধার দিয়ে পুরাতনের বন্ধন কেটে দিতে। এক এক করে' যখন পুরাতনের সমস্ত বন্ধন কাটা পড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব্ব-অর্জ্জিত সংস্কার থেকে সে মুক্ত হবে তখনই—আর সত্যও দেখ্‌তে পাবে সে তখনই। আর যে দিন সত্য দেখ্‌তে পাবে সে দিন পুরাতন হাসি মুখে এসে নতুনের পাশে দাঁড়াবে ও গৌরব করে' বলবে—নতুন, সে ত আমিই গড়ে তুলেছি—সে ত আমারই দান।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাদ্র, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সঙ্গীতের মুক্তি।

—:০:—

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য সঙ্গীত-সঙ্ঘ হইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ফরমাস এই যে, দিশি বিলাতি কোনটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটি মাত্র যোগ্যতা আমার আছে। তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।

তা বলিয়া জানি না বলিতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সঙ্গীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কি রকম সেটা একটু খোলসা করিয়া বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক, ব্যবসায়ীর জানা, আর এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।

এই নাড়ি নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্ব্বদাই একটা ভয় থাকে, ঐ নাড়িনক্ষত্র পদার্থটা না জানি কি! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি নক্ষত্রের দোহাই দিয়া অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়া রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্ত্তমান যুগের প্রধান সর্দ্দার হচ্চে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে "অধিকাংশ।" অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলিবার অধিকার আছে। এমন কি, তার অধিকারই বেশী। যে বলে আমি জানি সেই কেবল কথা কহিয়া যাইবে, আর যে জানে আমি জানি না সেই চুপ করিয়া যাইবে এখনকার কালের এমন ধর্ম্ম নহে। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলিব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলায় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের অনেক মত কেননা তাদের রাস্তাই নাই। তাই বহু সেয়ানার এক প্রতিনিধি চলে কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যত-গুলিই মানুষ ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব নিকাশের সময় হয়ত দেখিবেন আমার মতের মিল একব্যক্তির সঙ্গেই আছে, এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশী। কেননা, পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই, সে দিক দিয়া যে চলে সে-ই বেশী দেখে বেশী ঠেকে। আমি পথ জানিনা বলিয়াই হোক্ কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক্ এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেই জন্যই হয়ত মনোরম হইতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে লইয়া। যে-মানুষ রচনা করে

আর যে-মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করিয়াছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার মাঝখানে আছে ওস্তাদ। মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত বাধাও হইতে পারে আবার সুয়েজ ক্যানালের মত সুযোগও হইতে পারে। তবু যাই হোক্, উপসর্গ বাড়িলে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্ত মত সমাবেশ, সংসারে এইই ত যথেষ্ট দুর্লভ—তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড় কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেক খানি জায়গা জুড়িয়াছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশী খাতির করিতে হয় তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সঙ্গীতকেও যেন ছাড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ বড় কি রাধা বড় এ তর্ক শুনিয়াছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড় কি না এই তর্কটা বাড়িল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে-ই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে পড়িয়া, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা ত মাটির মানুষ, কিন্তু আমলা! তার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভালো! নিজের "রাজ-কর্ম্মচারী" নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নাই সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরো-

ক্রেসি উচুদরের জিনিস হইতে পারে না। আমাদের সঙ্গীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটিল।

এইখানে য়ুরোপের সঙ্গীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-পলিটিক্সের তফাৎ। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশী বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্ত্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিবার জন্যে। য়ুরোপে গান-সম্বন্ধে যে-কর্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাহাই দুইজনে বখ্‌রা করিয়া লইয়াছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়ালা। যেখানে কর্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্ত্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে-মানুষ গান বাঁধিবে আর যে-মানুষ গান গাহিবে দু'জনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে ত রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে-গান গাওয়া হইতেছে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয় তাহা যে তখন-তখনি জীবন উৎস হইতে তাজা উঠিতেছে এটা অনুভব করিলে

শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হইয়া থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ ইহাদের জোড় মেলে কিন্তু প্রায় মেলে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্ত্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হইয়া থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হইয়া আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়াইয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহা বরাবর দেখা গেছে। এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিলিত গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পাইত লড়াইয়ের নয়। তখন এমন সকল শ্রোতাও নিশ্চয় ছিল যাঁরা সঙ্গীত ভাট-পাড়ার বিধান যাচাইয়া গানের বিচার করিতেন না। কেননা, শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।

আমাদের কালোয়াতি গানের এই যে রাগরাগিণী ইহার রসটা কি? রাগ শব্দের গোড়াকার মানে রং। এই শব্দটা যখন মনের সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয় তখন বোঝায় ভালো লাগা। বাংলায় রাগ

কথাটার মানে ক্রোধ। ইংরেজিতে passion বলিতে ভালো লাগা আর ক্রোধ দুইই বোঝায়। ভালো লাগা আর ক্রোধ এই দুয়ের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। এই দুটো ভাবেই চিত্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এই দুয়েরই এক রং, সেই রংটা রাঙা। ওটা রক্তের রং, হৃদয়ের নিজের আভা।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে। ভোর-বেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু-একটা আছে, যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্ব্বচনীয়। যাহা নির্ব্বচনীয় তাহা পৃথক, তাহা আপনাতে আপনি সুনির্দ্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। এই বেশীটুকুই তার সঙ্গীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিলরে দুলিল
মানস সরসে রসপুলকে;
পলকে পুলকে ঢেউ তুলিল!
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে;

গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হইল—ভাষার একেবারে উলট পালট হইয়া গেল। যার রূপ নাই সে রূপ ধরিল, যার রূপ আছে সে অরূপ হইল। এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিতেছে কোথায় ? সৃষ্টি যেখানে অনির্ব্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়াইয়া যাইতেছে।

আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্ব্বচনীয় বিশ্বরসটিকে নানা বড় বড় আধারে ধরিয়া রাখার চেষ্টা হইয়াছে। যখন কল হয় নাই তখন কলিকাতায় গঙ্গার জল যেমন করিয়া জালায় ধরা হইত। যজ্ঞকর্ত্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে সেই রস পরিবেষণ করিতে পারেন কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হইতে সেটা বহিয়া আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোর বেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা ; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি ; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা ; মূলতান যেন

রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই যে সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাহাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাসতা নাই তাহাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নর নারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাইতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তাহারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, তাহা রাগিণী নয়, তাহা সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা, দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতার উপরের দিকে একটু ইসারা করিয়া দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী বলিয়া চলে সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলিতে থাকে, অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল করিয়া যে-মূর্ত্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমের যে সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করাইয়া রাখে।

আমাদের বেদমন্ত্রগানেও ঐরূপ। তার সঙ্গে একটি সরল সুর লাগিয়া থাকে, মহারণ্যের মর্ম্মর-ধ্বনির মত, মহাসমুদ্রের কল-গর্জ্জনের মত। তাহাতে কেবল এই আভাস দিতে থাকে যে এই কথাগুলি এক-দিন দুই দিনের নহে, ইহা অন্তহীন কালের, ইহা মানুষের ক্ষণিক সুখ দুঃখের বাণী নহে; ইহা আত্মার নীরবতারই যেন আত্মগত নিবেদন।

মহাকাব্যের বড় কথাটা যেখানে স্বতই বড়, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোট করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু যেখানে আবার সঙ্গীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলি বলিতে থাকে আমি কেহই না, আমি কিছুই না; আমার মহিমা সুরে। এই জন্য হিন্দুস্থানী গানের কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুসি-তাই। এই যে পূরবীর গান—

"লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া
ক্যয়সে ধঁরু মেরে শিরো পয় গাগরিয়া।"

এর মানে, শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার "বিড়ে"টা চুরি করিয়াছে। এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড় সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধিবা-মাত্র মন বলে, এই যে কলসী এই যে বিড়ে, এ ত সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি, যার দাম বলিবার মত ভাষা জগতে নাই, যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সঙ্গীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিস নয়। কেননা বিকৃতিকে লইয়াই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তাহা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্টহাস্য নহে। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই

আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া, যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারি যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করিলে রাগরাগিণী যদিবা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হইয়া যায়। আমাদের হাল ফেশানের কন্সর্টের গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা কাটা হইয়া নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা লইয়া আমাদের সঙ্গীতের গভীরতা। এই সব কাটা সুরগুলিকে লইয়া নানা প্রকারে খেলানো যায়,—উত্তেজনা বল, উল্লাস বল, পরিহাস বল, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বল, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে নির্ব্বিকার ভাবে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহারা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিম্বা অসুবিধা আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলি অমৃত পান করিতেছেন কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যেরা উৎপাত না করিলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠিত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে পারেন কিন্তু সেখানে ফুল গাছের একটা চান্‌কাও তাঁরা বদল করিয়া সাজাইতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্ত্যলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি,

বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। ইহা চিরসম্পূর্ণ। এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্ত্যলোকের দুঃখ সুখের অন্তহীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা লইয়া যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তার সুরগুলিকে কাটা-কাটা রাখিলে একই রাগিণীর দ্বারা নানা প্রকার হৃদয় ভাবের বর্ণনা হইতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে করিয়া পরস্পরের গায়ে হেলাইয়া গাওয়া যায় তা হইলে হৃদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপিয়া গিয়া রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এটা কেমনতর? যেমন দেখা গেছে, খুড়তত, জাঠতত, মাসতুত, পিসতত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতির বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হইয়া একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার হইতে বাহির হইয়া জাহাজের খালাসিগিরি করিয়া নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়া আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজভাবে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছে। আগে সে পরিবারের ঠেলা গাড়িতে পূর্ব্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধি বরাদ্দমত হাওয়া খাইত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নাই। বাঁধন-ছাড়া সুরগুলো যে-গানকে গড়িয়া তোলে তার খেয়াল নাই সে কোন শ্রেণীর, সে এই জানে যে "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।"

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু, আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন সে নিজের আশা

আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়া আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করিতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত। তা হইলে, যা-কিছু আছে তাহাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। শাসন-তন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক্ তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির

অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নহে। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হইয়া নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র করিয়া তোলে তখন তাহাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকিল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদীর কাছে কার্ত্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে।

আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁইয়াছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নাই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পাইতেছি। আমাদের নূতন-জাগরুক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কাটিয়া আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখিতেছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাহিরে আসিলাম। আমাদের সামনে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চলিব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হইতে ছাড় পাইয়াছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্বযাত্রার তালে তাল রাখিয়া না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নাই।

হয়ত সেও চলিতে সুরু করিয়াছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাইবে না। একদিক হইতে দেখিলে মনে হয় যেন

গানের আদর দেশ হইতে চলিয়া গেছে। ছেলেবেলায় কলিকাতায় গাহিয়ে বাজিয়ের ভিড় দেখিয়াছি; এখন একটি খুঁজিয়া মেলা ভার, ওস্তাদ যদি বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরো কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্য্যন্ত সবল অবস্থায় টিঁকিতে পারে এমন ধৈর্য্য ও বীর্য্য একালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড় বড় মজ্‌বুৎ জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে। এমন কি হাল্‌কা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙিবার বেলায় বড় জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষে। অন্ততঃ তার ধারা আর সচল নাই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন করিয়া তৈরি হইত এখনো তেমনি করিয়া হয়। কেননা প্রাচীন স্থাপত্য যে সকল রাজা ও ধনীর বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াছিল তারাও নাই সেই অবস্থারও বদল হইয়াছে। কিন্তু দেশের যে-জীবনযাত্রা কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন করে তার কোনো বদল হয় নাই।

আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাট-সভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য-সঙ্গীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিঁকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নহে। তার উপরেও আর একটা বৃহৎ লোকস্তর জমিয়া উঠিতেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটিল। চিরাগত প্রথার খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলায় না। তাহা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ

দিয়া চলিতেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রহিল না, বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যে দিকে জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সেদিকের মত হয় নাই। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলিতেছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হইবে।

এই যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে ইহার কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাই একদিকে গান-বাজনার পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনি আদরও দেখিতেছি। আজকাল ঘরে ঘরে হার্ম্মোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট। ইহাতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দিবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভাসিয়া ওঠে। সেই গাদ কাটিতে কাটিতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্ম্মল হইয়া আসে। আজ টগ্‌বগ্‌ শব্দে সঙ্গীতের সেই গাদ ফুটিতেছে; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবার দরকার নাই। সু-খবরটা এই যে চিনির জ্বাল চড়ানো হইয়াছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হইয়াছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হইয়াছে সর্দ্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শুনিবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনের কাটতি। যুবক মহলে গায়কের আদর সে গান জানে বলিয়া, সে ওস্তাদ বলিয়া নয়।

পূর্ব্বে ছিল দস্তুরের মই দিয়া সমতল করা চষা জমি। এখন তাহা ফুঁড়িয়া নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে। ওস্তাদের ইচ্ছা ইহা-

দের উপর দিয়া দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান্ খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সহিতে পারে না। শাসনকেই সে বড় বলিয়া জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতাকে শিকল পরাইলে চলিবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হইলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড় বেগ। তাকে ইণ্টারন্ করিয়া যদি সলিটরি সেল্-এর দেয়ালে বেড়িয়া রাখা যায় তবে তাহাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হইবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করিতেই চায় দমন করিতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড় যারা তারা সেই দায় স্বীকার করিয়াও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হল্‌দে হইয়া যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হইয়া ওঠে।

এইবার এই বর্ত্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দুই একটা কথায় বলিয়া লই। কেননা গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করিয়াছি তা ঐ অঞ্চল হইতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়িয়াছিলাম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খাইয়াছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে-মহল হইতে পিঠের উপর বাড়ি যে কম পড়িয়াছে তার কারণ এখনকার কালে সে-দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড় নাই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হইতে পারি নাই। দেখিলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু

বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলিবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীত রচনাতেও স্বরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। কিন্তু পরমাণু দিয়া গাছের বিচার হয় না, কেন না তারা বিশ্বের সামগ্রী, এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি স্বর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তারাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই সব দানা-বাঁধা স্বরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনিতে শুনিতে যখন অভ্যাস হইয়া আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখিতে পাওয়া সহজ হয়। এই স্বরসংস্থানটা রূঢ়ি নয় ইহা যৌগিক। তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি স্বরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়।

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রী ইঁট সাজাইয়া ইমারৎ তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়া যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিম্বা মহল দেওয়া যাইত তবে ইমারৎ গড়ায় তার নিজের বাহাদুরী তেমন বেশী থাকিত না। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মত হইলেই তাদের দিয়া ব্যক্তি-গত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মত হইলে তাদের দিয়া জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমা-

দের দেশের গানের ঠাট এক-একটা বড় বড় ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামত কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুক্‌রাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়িতে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি লক্ষ্য থাকে তবে এই বাঁধন আমাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর-একদিকে বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্নকে বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোষ করিতে করিতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যলাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটিয়াছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটাইয়া লইতে হইবে, সেও কাজে লাগিবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যে-ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন, যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লাগিয়া থাকিয়া তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য্য দান করিতেছে। যে-দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হইয়া আকাশের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়াছে সেখানে পার্ব্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি

আমাদের দেশের গান যেমন করিয়াই তৈরি হোক্ না কেন, রাগ-রাগিণী সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত তাহাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করিতে থাকিবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের স্থরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই স্থরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের স্থর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের স্থর যে একঘরে', রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই স্থরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলিন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতের পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই স্থর, বিলিতি স্থর নয়।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক স্থরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে কিন্তু তবুও তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাদের জাত যাইবে বটে কিন্তু জাতি যাইবে না। তারা সচল হইবে, তাদের সাহস বাড়িবে; নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। সেই টুকরা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বাড়িয়াছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা

আমাদের মন হইতে যায় না। এমন কি, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটিয়া ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব লইয়া ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মত কিম্বা কন্সর্টের তারস্বর গৎগুলার মত নীরস খাপছাড়া হইবে না, তাহা চারিদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে। তাহা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখিবে অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করিবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রহিয়া গেছে তার উত্তর দিতে হইবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে-হার্ম্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহা চলিবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, "না, ওটা আমাদের গানে চলিবে না, ওটা য়ুরোপীয়।" কিন্তু হার্ম্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় বলিয়াই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলিতে হয়, তবে এ কথাও বলিতে হয়, যে, যে-দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্র-চিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালীর দেহে ওটা চালাইতে গেলে ভুল হইবে। হার্ম্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হইত তবে ত কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু ইহার সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নাই। ইহার অভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাইবে।

তবে কিনা ইহাও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্ম্মনি ব্যবহার করিতে হইলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হইবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলিয়া চলিতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে আস্পর্দ্ধা হইবে। আমা-

দের দেশে ঐ বড় সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থাকিয়া চারিদিকে খুব করিয়া ডালপালা মেলিয়াছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করিলে তাকে মারা হইবে। শীতদেশের মত অত্যন্ত ঘন ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখিতে হইবে তারা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।

বসিয়া যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারি হইলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করিতে হইলে বোঝা হাল্কা করা চাই। লোকসান না করিয়া হাল্‌কা করিবার ভালো উপায় বোঝাটাকে ভাগ করিয়া দেওয়া। আমাদের গানের বিপুল তান-কর্ত্তব ঐ হার্ম্মনি বিভাগে চালান করিয়া দিলে মুল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা পায় অথচ তার গতি-পথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বহিয়া রাজাকে যদি চলিতে হয় তবে তাহাতে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানাস্থানে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বই কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ঐদিকে চালান করিয়া দিতে পারি। যাইহোক্ আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে এই একটা বড় মহল ফাঁকা আছে এটা যদি দখল করিতে পারি তবে এইদিকে অনেক পরীক্ষা ও উদ্ভাবনার জায়গা পাইব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগিল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে পড়িয়া। আজ হোক্ কাল হোক্ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামিবে।

সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড় দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করিয়াই বাড়িয়া ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখ, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করিয়াছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্ত্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝে হইতে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড় হয় তখন দরকারটাই মাটি হইতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড় করিতে হইয়াছে কেননা মাঝারির হাতে কর্ত্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশী ছাড়া পাইয়াছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকাইয়া না চলে তবে ত সে নাস্তানাবুদ্ করিতে পারে। কর্ত্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশী কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হইয়া কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুল-চেরা হিসাব দাখিল করিতে হয়। সেখানে কণ্ট্রোলার আপিস কেবলি খিটখিট করে এবং কাজ চালাইবার আপিস বেজার হইয়া ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো

মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি সেটাকে বদল করিতে পারে না। ইহাতেই সুরেতালে রেষারেষি বন্ধ হইয়া যায়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নাই, তাহা হার্ম্মনি বিভাগে গানের অন্তরঙ্গ রূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তাহা লইয়া লাঠিয়ালি করিতে চায়, কেনমা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিয়া পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তাহা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাহাতে বৈচিত্র্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কি উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক্ আমার গানের কথাটি এই :—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।

দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কি মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুসী ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই, তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নাই কেন তাহা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাত মাত্রার পর "নিল কায়া" এই চার মাত্রা খাপ খাইল। তিন মাত্রা হইলেও ক্ষতি হইত না—যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু ইহার মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন, "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাকিত তবে দিব্য চলিত, যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর।" এ আমি বলিতেছি কানের স্বাভাবিক

রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব ?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সবসুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নাই। যেমনঃ—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৩+৪+৩=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ করিয়া গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরিতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল, "আমার সমের মাশুল চুকাইয়া দাও!" আমি ত বলি এটা বেআইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে; আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কি গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই :—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে।
আকাশে কি গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চল খানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হয়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পূরি
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি
বিরহ সাগরের কূলে।

এটা যে কি তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গণিয়া দেখিলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন

তালের সৃষ্টি করা যাক্ তবে আর একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে বাঁধনে তারে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
মহা পারাবার পারায়ে
ফিরিল না আর তরীতে
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
কি ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

এও নয় মাত্রা, কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা নয়ের তাল দেখা যাক্ :—

আঁধার রজনী পোহাল
জগৎ পুরিল পুলকে
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে।

নয় মাত্রা বটে কিন্তু এ ছন্দ স্বতন্ত্র। ইহার লয় তিন তিন তিনে। ইহাকে কোন্ নাম দিবে? আরো একটা দেখা যাক্।

দুয়ার মম পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।

শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ পাখী!
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

এও ত আরেক ছন্দ। ইহার লয় পাঁচে চারে মিলিয়া। আবার এইটেকে উল্টাইয়া দিয়া চারে পাঁচে করিলে ন'য়ের ছন্দকে লইয়া নয় ছয় করা যাইতে পারে। চৌতাল ত বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা করিলেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই ত বারো মাত্রা :—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে!
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

ইহা চৌতালও নহে, একতালাও নহে, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল লইয়া কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাৎ চলিবে না। আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাহিরের জিনিস নয়, তাহা বিশ্বের বলিয়াই তাহা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাহিরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়। এইরূপ মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিতে থাকিবে।

এই ত গেল সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক উপদ্রব। আবার বাহিরে একদল বলবান লোক আছেন তাঁরা সঙ্গীতকে দ্বীপান্তরে চালান করিতে পারিলে সুস্থ থাকেন। শ্যামের বাঁশির উপর রাগ করিয়া রাধিকা যেমন বাঁশবনটাকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপাড়িতে চাহিয়া ছিলেন ইঁহাদের সেই রকম ভাব। মাটির উপর পড়িলে গায়ে ধূলা লাগে বলিয়া পৃথিবীটাকে বরখাস্ত করিতে ইঁহারা কখনই সাহস করেন না কিন্তু গানকে ইঁহারা বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করেন এই সাহসে যে, তাঁরা মনে করেন, গানটা বাহুল্য, ওটা না হইলেও কাজ চলে এবং পেট ভরে। এটা বোঝেন না যে, বাহুল্য লইয়াই মনুষ্যত্ব, বাহুল্যই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। সত্যের পরিণাম সত্যে নহে, আনন্দে। আনন্দ সত্যের সেই অসীম বাহুল্য যাহাতে আত্মা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে;—কেবল আপনার উপকরণকে নয়। যদি কোন সভ্যতার বিচার করিতে হয় তবে এই বাহুল্য দিয়াই তার পরিমাপ। কেজো লোকেরা সঞ্চয় করে। সঞ্চয়ে প্রকাশ নাই, কেননা প্রকাশ ত্যাগে। সেই ত্যাগের সম্পদই বাহুল্য।

সঞ্চয় করাও নহে, ভোগ করাও নহে, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার যে প্রেরণা, তাহাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ বিলাস হয় তবে তাহাতে নির্জ্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হইবে। কেননা যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্ব্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহা হইলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড় হইবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড় হইবে।

এতদিন আমাদের ভদ্রসমাজ গানকে ভয় করিয়া আসিতেছিল। তার কারণ, যা সকলের জিনিস, ভোগী তাকে বাঁধ দিয়া আপনার করাতেই তার স্রোত মরিয়াছে, সে দূষিত হইয়াছে। ঘরের বদ্ধ বাতাস যদি বিকৃত হয় তবে দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তার যোগসাধন করা চাই। ইহাতে ভয় করিবার কারণ নাই, কেননা ইহাতে বাড়িটাকে হারানো হয় না। আজকালকার দেশাভিমানীরা ঐ ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরকে পাওয়াটাই আপনার বাড়িকে হারানো। যেন, যে-হাওয়া চৌদ্দ-পুরুষের নিশ্বাসে বিষিয়া উঠিয়াছে তাহাই আমার নিজের হাওয়া, আর ঐ বিশ্বের হাওয়াটাই বিদেশী। এ কথা ভুলিয়া যান ঘরের হাওয়ার সঙ্গে বাহিরের হাওয়ার যোগ যেখানে নাই, সেখানে ঘরই নাই সেখানে কারাগার।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। তারা আছে মাত্র তারা চলে না—দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভাঙিয়া আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া

দিতে হইবে। তা সে কি গানে, কি সাহিত্যে, কি চিন্তায়, কি কর্ম্মে, কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে! এই ছাড়া-দেওয়াকে যারা ক্ষতি-হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হইতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডারে বসিয়া উপবাসী। যারা শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া রাখে তারাই রাখে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী-স্ত্রী।

—:•:—

শাস্ত্র আর দেশাচারের সমবেত চেষ্টা এবং নিশ্চেষ্টতার ফলে আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির মানসিক গতি ও পরিণতি যে ধারা অনুসরণ করে চলেছে—তাতে আমরা সবাই খুব খুসী, এবং ঘরে বাইরে তা নিয়ে সময়ে অসময়ে যথেষ্ট গর্ব্ব প্রকাশ করতেও অল্প বিস্তর ব্যগ্র। ব্যাপারটাকে তর্কের অতীত করে', পদ্যের ছাঁদে বেঁধে আমরা বলে' থাকি,—

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা,
কোথা দিতে তাদের তুলনা ?"

উপরের চরণের "রূপবতী" কথাটাকে "চ-বৈ-তু-হি"র দলে ছেড়ে দিলে আশা করি কারো বিরাগ-ভাজন হবার আশঙ্কা নেই। আর, তাহলে বাকী যা রইল তার মানে দাঁড়াল এই যে—সাধুতা আর সতীত্বে ভারত-ললনা জগতে অতুলনীয়া। কিছুদিন আগেও যে দেশে ধরে বেঁধে "সতী" করবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে দেশের পক্ষে এমন ধারা দাবী একেবারে অসঙ্গত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না! পাতিব্রত্য যে হিন্দুরমণীর পক্ষে একটা জাতিগত সংস্কার এবং জন্মগত উত্তরাধিকার, সে কথা মেনে নিয়েই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

তবে, এ সব বিষয়ে, আমাদের সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের তুলনা অনেকটা বকের বাড়ীতে শেয়ালের নিমন্ত্রণের মতই অশোভন ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণের অতিমাত্র শৃঙ্খলা-প্রিয়তার ফলে সমাজে স্ত্রী-জাতির পক্ষে কার্য্যতঃ যে লক্ষ্য এবং সাধনা সেকালে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, তা বহুকাল ধরে আমাদের "সনাতন জড়তার" ভিতর দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে এখন যে আকার লাভ করেছে সেটা অপর সকল সভ্যসমাজ থেকে ভিন্ন রকমের!

"সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো" মনে করে' আমরা ধীরে ধীরে আমাদের স্ত্রী-জাতিকে "স্ত্রী"র জাতিতে পরিণত করেছি! স্ত্রীত্বেই তাদের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ; বর্ণমালার অনুস্বর বিসর্গের মত সদাই তারা আশ্রয়-স্থানভাগী; কোনো রকম স্বাতন্ত্র্যই তাদের প্রাপ্য এবং গ্রাহ্য নয়—এ কথা নানান্ রকমে তাদের শুনিয়েছি, পড়িয়েছি,—শিখিয়েছি, বুঝিয়েছি। আমাদের স্ত্রী-জাতিকে আমরা দেখি—বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের পুরুষ-জাতির মধ্যে যোজকের মত। ব্যাপারটাকে তর্কের সময়ে যতই আমরা আধ্যাত্মিক আভায় এবং সামাজিক সম্ভ্রমে ভূষিত করি না কেন, সে গৌরব অনুভব ও উপভোগ করবার মত মার্জ্জনা এবং স্বাধীনতা সাধারণতঃ আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির থাকে না।

শিশুকালে বর্ণসংযোগের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কণ্ঠস্থ করি—"স্বামী পরম গুরু", "বন্ধ্যা নারীর আদর নাই"!—এ রকম সব দাম্পত্য এবং পারিবারিক সত্য ও সিদ্ধান্ত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে শিশু-হৃদয়ে মুদ্রিত করবার প্রথা আর কোনো দেশেই নেই।

তারপর শৈশব অতিক্রম কর্‌তে না কর্‌তেই রূপকথা, ব্রতকথা ও উপকথার উপদ্রবে নারী-জীবনের গণ্ডী ক্রমশঃ আমাদের কাছে সংহত এবং সুনির্দ্দিষ্ট হতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-জাতির মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের প্রশ্নেরও সমাধি হয়—"হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা" দিয়ে!

এম্নি করে' নারীজাতির মনুষ্যত্বের বিনিময়ে আমরা স্ত্রীত্বের বনিয়াদ্ পাকা করি! এ যেন প্রাণ দিয়ে চোখ বাঁচানো। পাতিব্রত্য অতি উপাদেয় পদার্থ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু মনুষ্যত্ব তার চেয়ে ঢের বেশী মহার্ঘ। যে স্ত্রীত্বের মূলে রয়েছে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব,—যা মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বয়োগুণে স্ত্রী-হৃদয়ে স্বভাবতঃই ফুটে ওঠে নি,—পারিপার্শ্বিক প্রেরণা এবং অপ্রাকৃত উত্তেজনার ফলে গোটা মনুষ্যত্বই যেখানে বিকৃত এবং সংহত হয়ে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়েছে সেখানে তা নিয়ে ঢাক ঢোল পেটানো বুদ্ধিমানের কাজ বলে ত মনে হয় না।—তরকারী হিসেবে বাঁধা কপি উপাদেয় হলেও গাছ হিসেবে সে যে অতি বিশ্রী!

আমাদের সমাজের আত্মবিস্মৃত স্ত্রী-জাতির এই তথাকথিত পাতিব্রত্যে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের কোনো মহৎ কল্যাণই সাধিত হবারি সম্ভাবনা নেই! অভিজ্ঞতার উপরে যা প্রতিষ্ঠিত নয়, ঘাত প্রতিঘাতে যার মেরুদণ্ড শক্ত হবার অবসর পায় নি, প্রতি পদে শাস্ত্র আর দেশাচারের উপর ভর দিয়েই তার জান্ বাঁচাতে হবে। নিজের চোখ যার ফুটতে পায় নি—শাস্ত্রের চোখে দেশাচারের চস্‌মা এঁটেই তাকে সব দেখতে হবে! রজ্জুকেও তার সর্প জ্ঞান করে তফাৎ থাকতে হবে—নৈলে সর্পে রজ্জুভ্রম হবার

আশঙ্কা! দুগ্ধপোষ্য মামাশ্বশুরকে দেখলে ঘোম্‌টার আয়তন তার বাড়াতে হবে; আর বাপের বয়সী ভাসুরের ছায়া স্পর্শ করলে "তেরাত্র" তাকে উপবাস কর্‌তে হবে! এই তার পক্ষে বিধি।

নন্দলাল বহুকষ্টে কিছুদিন তার ভীষণ পণ রক্ষা কর্‌তে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার বাড়া নিশ্চয়ই আর বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশের স্ত্রী-সমাজও শাস্ত্র আর দেশাচারের কল কৌশলে মরে বেঁচে পত্নীত্ব বাঁচিয়ে চলে বটে, কিন্তু তাতে "পতি নারায়ণ" ছাড়া আর কোনো দেবতাই প্রসন্ন হন না। "পতি-নারায়ণ"কে অযথা অবজ্ঞা করতে আমি বলিনে, কিন্তু তারি মোহে "সত্যনারায়ণের" প্রসাদ উপেক্ষা করলে—বিনি তুফানেও ঘাটে এসে ভরাডুবি হয় সে কথা ত "পাঁচালী"তেই লেখা রয়েছে! সাধারণ ভাবে সেই কথাটার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধেরও উদ্দেশ্য।

(২)

দাম্পত্যদায়িত্বে যে কর্ত্তব্যবিভাগ সাধারণতঃ আমাদের সমাজে দেখা যায়, সেটা কি সমাজ তত্ত্ব কি মনস্তত্ত্ব, কোনো দিক দিয়েই সমর্থন করা চলে না। নিরুপায় স্ত্রীর স্কন্ধে সমস্ত নৈতিক দায়িত্বটা নিঃশেষে চাপিয়ে স্বামীর হাতে দেওয়া হয়েছে আর্থিক দায়িত্ব, আর সার্ব্বভৌমিক অধিকার। আমাদের সমাজে স্বামীদের নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান নেই—এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে তার অনুশীলন এবং সম্পাদন হচ্ছে স্বামীর খুসী—অর্থাৎ optional—এই কথাই আমি বিশেষ করে' বল্‌তে চাই। এ কথা আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধেও বলা

চলে। স্বামী উপার্জ্জনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হ'লে সমাজে কিছুই বলার থাকে না (স্ত্রীর ত' থাক্‌তেই নেই সে কথায়)।—খেয়াল হ'লেই স্বামী "সংসার" ত্যাগ করে' কোনো "আশ্রম" বা "আড্ডায়" ভিড়ে যেতে পারেন—আর তাতে সমাজের বাহবাও অনেক স্থলে তাঁর জুটে থাকে! কিন্তু স্ত্রীর বেলায় পান থেকে চুণটুকু খস্‌লেই প্রলয়! যে পথের কথা তার কাছে বাৎলে দেওয়া হয়েছে, তা' কাদাজলে যতই পিছল, আর কাঁটাবনে যতই দুর্গম হোক না প্রাণের দায়ে তা' থেকে একটু এদিক-ওদিক হলেই তাকে যেতে হবে একেবারে রসাতল!

জামাতা বাবাজিকে আশীর্ব্বচন লিখ্‌তে আমরা "নিরাপদ্ দীর্ঘ-জীবেষু"র চাইতে বেশী কিছু লেখা বাহুল্য এবং অনাবশ্যক মনে করি; কিন্তু বধূমাতার বেলায় "সাবিত্রী সমতুল্যাসু"র কমে কিছুতেই চলে না। কেবল আশীর্ব্বচন লিখ্‌বার বেলাতেই যে এমন ধারা পক্ষপাত তা নয়; দুর্ব্বচন প্রয়োগের সময়েও আদান প্রদানটা এই অনুপাতেই হয়ে থাকে! সে কালে নাকি যে পাপে শূদ্রের প্রাণদণ্ড বা নাসাকর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা হ'তো ঠিক সেই পাপের দরুণই ব্রাহ্মণের নামমাত্র অর্থদণ্ডই যথেষ্ট বিবেচিত হ'তো! একালে আমাদের স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক দণ্ডও এই আইনেরই ধারা অনুসরণ করে' চলে। শাদা এবং স্বল্প কথায় বল্‌তে গেলে আমাদের সমাজে স্বামীর অপরাধের দণ্ড নেই,—আর স্ত্রীর দোষের মার্জ্জনা নেই! শুধু তাই নয়; অনেক সময়ে স্বামীর দোষে স্ত্রীই অবমানিত হয়। স্বামী-স্ত্রীতে একাত্মবোধ আর কোনো সমাজেই এতটা ঘনীভূত হ'তে পারে নি!—এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

সত্যবানের মত যজ্ঞনিষ্ঠ, অথবা পুণ্যশ্লোক নলের মত সত্যব্রত না হয়েই আমরা সাবিত্রী দময়ন্তীর কামনা করে' থাকি!—কাযেই, শাস্ত্রে

যে বলে—কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি—তার প্রমাণ আমরা অহরহই ঘরে ঘরে দেখ্‌তে পাই। হরধনু-ভঙ্গের শক্তি অনেক কাল হ'লই অন্তর্হিত হয়েছে সমাজ থেকে, কিন্তু সীতা-লাভের সখ্‌ পূরামাত্রাতেই বর্ত্তমান! সখের নেশায় আমরা একেবারেই ভুলে যাই যে—এ ঘোর কলিতে ভূঁই ফুঁড়ে সীতার আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা নেই! আর তা' থাক্‌লেও তাঁকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত কর্‌বার মত জনক কোথায়? ত্রেতায় যখন সমাজে ত্রিপাদ পূণ্য আর এক পাদ মাত্র পাপ ছিল, তখনও জনক মাত্র একজনই জন্মে ছিলেন!—আর, এখন এই ঘোর কলিতে যদি আমরা সকলেই নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ীকে মিথিলাপুরী বলে' অনুমান করে' বসি,—তা' হ'লে বাকী সবও উক্তরূপ অনুমান দিয়েই উপভোগ করতে হবে;—প্রত্যক্ষ কর্‌তে চাইলেই নেশার স্বপন ছুটে যাবে।

মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর পাতিব্রত্য সহজ, সার্থক এবং কল্যাণকর কর্‌তে হ'লে স্বামীর মনুষ্যত্ব আগে জাগাতে হবে। সংযম এবং শিক্ষার অভাবে যেখানে পুরুষ ক্রমেই অপাত্রে পরিণত হচ্ছে, সেখানে স্ত্রী-জাতির উপর কঠোর বিধানের ব্যবস্থা কর্‌লে কেবল তাদের মনুষ্যত্বই পঙ্গু হবে; আর সমাজের ঘরের আবর্জ্জনা আঙ্গিনায় এসে জড়ো হবে।

স্ত্রীকে "দেবী" করে' তুল্‌বার জন্যে আমাদের সমাজে যেমন ধারা ধরাধরি, বাঁধাবাঁধি, কষাকষি চলেছে, এর সিকির সিকি আয়োজনও যদি স্বামীকে দেবতা করে' তুলবার জন্যে নিয়োজিত হ'তো, তা' হ'লে বরং আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক হ'তো,—আর আমরাও হয়ত এমন ধারা অমানুষ হতাম না। কিন্তু তা হয় নি!

একচোখো সামাজিক অনুশাসনে আমাদের স্বামীসম্প্রদায় ক্রমেই দুঃশাসন হয়ে' উঠেছে, আর স্ত্রীসমাজ জীবন্মৃত হয়ে' পড়েছে!—অর্থাৎ এক কথায় তাঁরা হয়েছেন "নরমের যম", আর এঁরা হয়েছেন "শক্তের ভক্ত"। এম্নি করে নরমকে নুইয়ে আমরা সমাজকে শৃঙ্খলিত করেছি!

স্মৃতি-সংহিতা সঙ্কলনের ঢের আগে, মানব-সমাজের অতি প্রারম্ভে, যখন মানুষে আর বাঘভালুকে প্রকারগত বিশেষ কোনই পার্থক্য ছিল না—সামাজিক শৃঙ্খলার এই সহজ সিদ্ধান্তটী তখন মানুষ আবিষ্কার করেছিল। তারপরে, সভ্যতার বিস্তৃতি এবং উন্নতির সাথে সাথে স্বামী সম্প্রদায়ের এই স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী ক্রমশঃ সংস্কৃত হয়ে আস্ছে। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ সমাজ কত উন্নত,—সে সমাজের স্ত্রী-জাতির অবস্থাই তার অন্যতম মাপকাঠি। পুঁথি পুরাণ থেকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক উদ্ধার করে', এ মাপকাঠির ব্যবহার আমরাও দরকার হ'লে করে থাকি। কিন্তু কর্লে হবে কি! পাঁজিতে অগাধ জলের কথা লেখা থাক্লেও তা' নিংড়ালে এক বিন্দুও পাওয়া যায় না। অনুষ্টুপ্ ছন্দে হাজার বছর আগে যা' লেখা হয়েছিল—এতদিন ধরে' আমাদের "সনাতন জড়তা" এবং জাতীয় দুর্দ্দশার কয়লা বালির ভিতর দিয়ে চুইয়ে এখন সোজা বাংলায় যে আকারে তা' বেরিয়ে এসেছে, তা নিয়ে আর গর্ব্ব কর্বার কিছুই নেই!

(৩)

অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথের মুখে বঙ্কিম বাবু এই স্বগত উক্তিটী দিয়েছেন :—

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিপদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পূণ্য!"

রোহিণীকে হত্যা করবার আগে গোবিন্দলালও ভ্রমর সম্বন্ধে অনেকটা এই ধরণের মতই ব্যক্ত করেছিলেন। তবে, তখন সময়টা খুব ভালো না থাকাতে, আর উক্তিটীও একেবারে স্বগত ছিল না বলে' ব্যাপারটা স্বভাবতঃই এর চেয়ে একটু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এ দুটী জায়গা পড়লেই আমার মনে হয়—"এত যদি সুখ তোমার কপালে, তবে কেন তোমার কাঁথা বগলে?" বস্তুতঃ আমাদের দেশে কাঁথা বগলে না আসা পর্য্যন্ত এ সব কথা ভাব্‌বার অবসর কোনো স্বামীরই হয় না—কারণ "পূড়্‌বে নারী উড়্‌বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই"—এই হচ্ছে আমাদের দেশাচার!

ও সব কথা যাক্। এখন আমি একটু গোলে পড়েছি ঐ "কেবল স্ত্রী" কথাটী নিয়ে। নগেন্দ্রনাথের কথায়—"সূর্য্যমুখী কেবল তাঁর স্ত্রীর ছিলেন না তিনি—সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত কমিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে

বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী”—এ সব ছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁরা “সম্বন্ধে স্ত্রী” এবং “কেবল স্ত্রী” সংসারে এসে কি তাঁরা করেন? আর, যা' করেন—সেই কি তাঁদের দুর্লভ মনুষ্য জীবনের পক্ষে চরম এবং পরম কর্ত্তব্য? নগেন্দ্রনাথের কথার ভাবে বোধ হয়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ স্ত্রীই “কেবল-স্ত্রী”। আমার মনে হয়, সূর্য্যমুখীর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে,—তাঁর ভিতরেও “কেবল স্ত্রী”রই প্রাধান্য ছিল—“অধিকন্তু স্ত্রীর” উপরে। তাঁর যে পলায়ন, সেটা নির্জ্জিত “অধিকন্তু স্ত্রার” প'রে বিজয়ী “কেবল স্ত্রী”র নির্ব্বাসন দণ্ড!

যথার্থই যদি তিনি নগেন্দ্রনাথের পক্ষে স্নেহে মাতা, পরামর্শে শিক্ষক, চিন্তায় বুদ্ধি—এ সব হতেন তাহলে নগেন্দ্রনাথের সংসার-প্রাঙ্গনের বিষ-বীজ অঙ্কুরিত হবার অবসর পেতো না! বিরহ-বিধুর নগেন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন—সংসারী নগেন্দ্রনাথ তেমন করে কখনো ভাবেন নি! সূর্য্যমুখী যদি সত্যিই তাঁর “চিন্তার বুদ্ধি” হবে, তবে কুন্দসম্বন্ধীয় অমনধারা সর্ব্বনেশে বুদ্ধি তিনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি সত্যিই সূর্য্যমুখীকে “স্নেহে মাতা” “পরামর্শে শিক্ষক” বলে ভাবতে পারতেন—তাহলে আর রূপের নেশা দমনের জন্যে তাঁকে মদের নেশার আশ্রয় নিতে হবে কেন?

বস্তুতঃ, শিক্ষিত এবং সাধারণ রকমের ধর্ম্মভীরু লোকে প্রলোভনের ভিতরে পড়লে গোল্লায় যাবার আগে যতটুকু ইতস্তত করে থাকে, গোবিন্দলাল বা নগেন্দ্রনাথ কেউই তার চেয়ে বড় বেশী কিছু করেন নি। এমন যে দেবীপ্রতিমা, প্রণয়শালিনী, পতিব্রতা, সদাহিতাকাঙ্ক্ষিনী স্ত্রী-রত্ন, তা তাঁদের এ সঙ্কট সময়ে কোনোই কাজে

আসে নি! (আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস,—এঁদের গৃহিণীরা যদি ভ্রমর সূর্য্যমুখী ছাঁচের না হয়ে উগ্রচণ্ডা-ক্ষেমঙ্করী ধাঁচের হতেন, তাহলে এত সব গোলমাল কিছুই হতো না।)

এর কারণ কি? আমাদের সমাজে সুশীলা সাধ্বী স্ত্রীরা প্রায়ই স্বামীর নৈতিক অধঃপতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না কেন? অনেকেই ত বউএর পরামর্শে ভাই ছাড়েন, মা ছাড়েন—কিন্তু কই; এমন ত শুনিনে,—কেউ কখনো স্ত্রীর চোখের জলে মদ ছেড়েছেন! এর কারণ বেশ স্পষ্ট। যে সব স্ত্রী স্বামীকে কুপরামর্শ দেয়, তারা রূঢ় অর্থে যতই সতী হোক না—পতিগতপ্রাণা তাঁরা নয়। তাদের চিন্তাগত একটী স্বাতন্ত্র্য আছে—আর সেটী মন্দের দিকে! কাজেই তারা সেই স্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকে, মন্দের টানে স্বচ্ছন্দে স্বামীকে নিজের পথে টেনে আনে! কিন্তু আমাদের পতিপ্রাণা স্ত্রীদের ত স্বামী থেকে স্বতন্ত্র সত্ত্বা থাকতে নেই। স্বামীকে "ভালো" করবার স্পর্দ্ধা তাঁরা মনেও আনেন না। নীরবে চোখের জল ফেলা ছাড়া পতনোন্মুখ স্বামীর উদ্ধার কল্পে আর কোনো উপায়ই ত তাঁরা জানেন না! যে স্বামী লক্ষ্মীরূপা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে রূপেয় নেশায় পাগল হতে পারে, সতীর চোখের জলের মর্য্যদা সে বুঝবে কেমন করে? কাজেই, স্ত্রী যখন বলেন মদ ছাড়তে, তাঁরা তখন জবাব দেন—"সূর্য্য-মুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও, নচেৎ আবশ্যক করে না।" কেবল মদ বলে নয় সব বিষয়েই আমাদের স্বামীদের এই এক বাঁধা জবাব! এ জবাবের নির্লজ্জতা এবং হীনতা তলিয়ে বুঝবার মত সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের স্বামীদের মন নেই—মাছের পক্ষে জল এবং পাখীর পক্ষে বাতাস যেমন সহজ-

প্রাপ্য, আমাদের সমাজে স্বামীর পক্ষেও সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিক নির্ভর এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা তেম্নি অনায়াস-লভ্য। কাজেই যে নাকি "ছাড়ালেও ছাড়বে না" তাকে দিনের মধ্যে দু' শ' বার "দূর করে" দিতে আর আপত্তি কি? যার আনুগত্য এত বেশী তার আধিপত্যে আর আশঙ্কা কি?

সমাজে এমন হয় কিনা জানিনে; কিন্তু গিরীশ বাবুর সামাজিক নাটক "গৃহলক্ষ্মীতে" এমনও দেখেছি পতিপ্রাণা সতী স্বামীর জন্যে নিজগৃহে বারবণিতা আনবার অনুরোধ কচ্ছেন—স্বামীর কাছে! আবার ধর্ম্মমূলক বিল্বমঙ্গলে অতিথিপরায়ণ 'বণিক' নিজ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অতিথির তুষ্টি সাধনে অনুরোধ করেছেন—সাধ্বী স্বামীর কথা ঠেল্‌তে না পেরে তাতেও সম্মত! এমন সকল আদুরে পতি আর আবাঢ়ে সতীর সৃষ্টি আমাদের দেশের মাটীতে, আর আমাদের সমাজের নাটকেতেই সম্ভব!

(৪)

"বালিকা বধূ" আর "কিশোরী প্রিয়া" পরম রমণীয় পদার্থ,—তাতে হয়ত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সংসারচক্রে Lubricating oil-এর বদলে লক্ষ্মীবিলাস্ খুব বেশী দিন কার্য্যকরী হয় না! কাঁচামিঠে আম পাকলে পান্‌সে হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী! আমাদের সমাজে প্রথম মিলন সময়ে বয়সের তারতম্য খুব বেশী থাকাতে স্বামী স্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থেকে যায়। এ ব্যবধান সবদিক থেকে মিটিয়ে নেবার জন্যে কোনো

তরফ থেকেই বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না! পৃথিবীর আর আর সব সভ্যসমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তা না থাক্‌লে তাদের সংসার চলে না। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর কাজ কর্ম্ম, চেষ্টা চরিত্র, এমন করে কেটে ছেঁটে ভাগ যোগ করে দেওয়া হয়েছে যে, যার যার মতন নিজ নিজ কক্ষায় থেকেও তারা বছরের পর বছর সংসারমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করে পারিবারিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্য শেষ করতে পারে। তাদের পরস্পরের বৈষয়িক মতামতের সংঘাত বা অপঘাতের কোনই সম্ভাবনা ঘটে না! "বুড়ি পরম বৈষ্ণব আর বুড়ো বেজায় শাক্ত" হওয়া সত্ত্বেও তারা "দুজনাতে মনের মিলে (!) সুখে" থাকতে পারে।

আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সহৃদয়তার একান্ত অভাব এমন কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল বল্‌তে চাই, আমাদের সাংসারিক শৃঙ্খলার পক্ষে সেটা অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য নয় বলে' অনেক স্থলেই সজ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত না হ'লেও অজ্ঞানে তা কতকটা উপেক্ষিত হয়। তারি ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সর্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি, একটা নিবিড় মিলন এবং পরিপূর্ণ সমবেদনা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। আমাদের চোখে যে মিলন খুব প্রগাঢ় বলে' প্রতীয়মান হয়, সেখানেও বুদ্ধি-বৈষম্যের একটা চোরা ফাঁক লুকোনো থাকে! শতসহস্র কাল্পনিক মিলনের মধ্যেও এই সত্যিকারের বিচ্ছেদটা চাপা পড়ে মারা যায় না। তবে সংস্কার এবং অভ্যাসের বশে—সর্ব্বোপরি, আমাদের সংসারিক জীবনের একঘেয়েমির দরুণ—আমাদের অনেকের কাছেই তা' ধরাপড়বার সম্ভাবনা নেই—একথা আমি স্বীকার করি!

এই বৈষম্যের ফলেই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখানে যত মিল, সেখানে তত গোঁজামিলন! আঘাত পেলেই তা' চটে বেরিয়ে পড়ে! বঙ্কিম বাবু "বিষবৃক্ষ" আর "কৃষ্ণ কান্তের উইলে"—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলালের মনের এই সব গোঁজা-গুঁজি, জোড়াতালি বাইরে এনে সমাজের সামনে ধরেছেন। রবিবাবুও "ঘরে বাইরে"তে ঠিক তাই করেছেন বিমলা সম্বন্ধে। সমাজ হয় ত তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। মানুষের মন ছিল তাঁদের লক্ষ্য, সমাজ উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু তাতে কি? মানুষের মন ত সমাজের আওতাতেই বেড়ে ওঠে! কাজেই, কবির সৃষ্টিকে সার্থক এবং স্বাভাবিক করতে, তাঁকে, বাধ্য হয়েই মানুষের মনের সাথে সাথে সমাজের পরিণতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে হয়েছে। কবির কথাকে কাজের সাথে খতিয়ে দেখাই জীবিত সমাজের কর্ত্তব্য! আমাদেরও তাই করতে হবে।

সামাজিক বিধিব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা অসঙ্গতি সব সমাজেই আছে, কোনো সমাজেই তা' দূর করবার জন্যে কথা ও কেতাবের অভাব নেই! কিন্তু আমাদের মত আলোচনাবিমুখ এবং সমালোচনাঅসহিষ্ণু সমাজ খুব কমই দেখ্‌তে পাওয়া যায়! আমরা "কৃষ্ণ কান্তের উইল" পড়ে' ভ্রমরের "চেলির বহর দেখে ভাল বল্‌ব কি মন্দ বল্‌ব বুঝে উঠ্‌তে পারিনে; আর বিষবৃক্ষ পড়ে' সূর্য্যমুখীর "বারানসীর" বাহার দেখে অবাক হই! ফলে,—আজ পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করে' উঠ্‌তে পারি নি, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের অঙ্গে কি মানায়! পাঠক রেলে ষ্টীমারে, সভা-সমিতিতে ক্রিয়াকর্ম্মে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ পেয়ে থাকেন!

শ্রাবণ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

'অচলায়তন'।

'অচলায়তন'খানি যেদিন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দশজনের চোখে পড়্‌ল সেদিন সে সঞ্চার করে' গিয়েছিল—প্রবীণের মনে মনে বিরাগ আর নবীনের বুকে বুকে পুলক। এর অবশ্য কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে এই 'অচলায়তন' খানিতে প্রবীণদের আরামে আঘাত কর্‌বার একটা চেষ্টা আছে কিন্তু নবীনদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে অবশ্য এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে সকল দেশেই সকল সময়েই প্রবীণদের মধ্যেও অনেক নবীন লুকিয়ে থাকেন আবার নবীনদের মধ্যেও অনেক প্রবীণ জন্ম নেন।

'অচলায়তন' রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটক। কিন্তু আমরা নাটক বল্‌লে যা বুঝি—শেক্‌স্‌পীয়ার কালিদাস বল্‌লে যা বুঝি—এমন কি, মেটারলিঙ্ক্‌ ইব্‌সেন্‌ বল্‌লেও যা বুঝি এখানি ঠিক তা' নয়। প্রথমতঃ চোখে-পড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নেই আর দ্বিতীয়তঃ মনে-লাগা বিশেষত্ব এই যে এতে পুরুষেরও যে চরিত্র-গুলো আছে তা মানুষের চরিত্র বল্‌লে সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। সে-গুলো যেন মানুষনামক ভগবানের যে সৃষ্ট জীবটী তারই বিভিন্ন বিভিন্ন ভাব—এক একটা দেহ অবলম্বন করে' ফুটে উঠেছে। মানুষের 'চরিত্রে' আর 'ভাবে' প্রভেদ এই যে—চরিত্রটা মানুষের বাহিরের কিন্তু ভাব জিনিসটা তার অন্তরের। মানুষের চরিত্র হচ্ছে

সেইটে যেটা ফুটে ওঠে যখন সে অপরের সংস্পর্শে আসে, অপরের সঙ্গে ব্যবহার করে—কিন্তু ভাব তার ভিতরের বস্তু আপনার সত্তাতেই যার অস্তিত্ব। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে যে প্রথমটা হচ্ছে মানুষের objective experience আর দ্বিতীয়টী হচ্ছে subjective experience, সেই জন্যেই আমরা এই অচলায়তনের পুরুষগুলোকে মানুষের 'চরিত্র' বলতে নারাজ—এরা যেন মানুষের বিভিন্ন বিভিন্ন 'ভাব'। পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য্য অদীনপুণ্য, দর্ভকেরা, শোণপাংশুদল এরা যেন সবাই, মানুষের মর্ম্মতলে তার জীবন-দেবতা বসে নিশিদিন যে বীণা বাজাচ্ছে, সেই বীণার এক-একটী সুর; বড় জোর এক একখানি গান—আর এদের কাছে যেটা বহির্জগৎ তারও অর্থ তাদের ওই নিজের নিজের গানের অর্থে। আর তাই পঞ্চকে মহাপঞ্চকে এত প্রভেদ—বিরোধ বল্‌লেও হয়। কিন্তু জীবন-দেবতা জানে যে এ প্রভেদ বিরোধ নয়—বরং ঠিক তার উল্টো। এরা মানুষের জীবনে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেই চলেছে। জীবন-দেবতা জানে সে কথা। এই জীবন-দেবতা হচ্ছে দাদাঠাকুর। আর তাই দাদাঠাকুর "একলা হাজার মানুষ" আবার "মজার মানুষ"ও বটে—তাই দাদাঠাকুর "কোণের মানুষ" আবার "সব মিলনে মেলার মানুষ"ও বটে। কারণ মানুষের জীবন-দেবতা অনন্ত গুণের দেবতা। সেখানে অনন্ত রঙের আলোতে অনন্ত রাগিণী উঠছে—বিরামহীন রাগের মূর্চ্ছনায় বিচিত্র বিচিত্র ছবি ফুটছে। ক্ষুদ্র, মহৎ, বন্ধন, মুক্তি, হাসি, অশ্রু, করুণ রুদ্র—সব সত্য হয়ে রয়েছে সেখানে—আনন্দময় হয়ে রয়েছে সেখানে। তাই দাদাঠাকুর যখন অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে নতুন করে সবায়

আবার প্রাচীর গড়তে আদেশ করলেন তখন সেখান থেকে বাদ দিলেন না কাউকেও—সেখানে সবাই রইল—পঞ্চকও মহাপঞ্চকও—যে দুজন চিরকাল অচলায়তনে পরস্পর পরস্পরের পথে বাধা হয়েই কাটিয়ে এসেছে।

(২)

এই বইখানিতে একটা বিষয় আছে যেটা সম্বন্ধে কারও ভুল করবার কোনই সম্ভাবনা নেই সেটা হচ্ছে এই যে—এর আসল লোক হচ্ছে পঞ্চক। এই পঞ্চক কে? অচলায়তনের সবাই যদি জীবন-দেবতার বীণার এক একটী স্বর হয়—তবে তার মধ্যে প্রথম স্বরটী—প্রধান স্বরটী হচ্ছে পঞ্চক। পঞ্চকের ঐ স্বর আছে বলে' আর সকল স্বরেরও ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চকের ঐ স্বর থামিয়ে দিলে আর সকল স্বরও একে একে থেমে যাবে। ঐ স্বর হচ্ছে মানুষের সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মুক্তির স্বর—এ জগতে ছাড়া-পাওয়ার স্বর।

সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মানুষ—যে মানুষ চায় প্রকাশ—চায় অনন্ত রাগিণীর মাঝে বিচিত্র আলোকের মাঝে ছন্দে ছন্দে তালে তালে প্রতি পলে পলে ফুটে উঠতে,—আপনাকে এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে। যেমন করে গাছ আপনার ডালপালা ছড়িয়ে দেয়, যেমন করে ফুলটী আপনার সৌরভ বিলিয়ে দেয়—তেমনি করে ছড়িয়ে দিতে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু কেন? কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য? কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। প্রয়োজন যদি

কিছু থাকে তবে সেটা ভীষণ রকমের গৌণ। এ ছড়িয়ে দেওয়ার "কেন"র উত্তর হচ্ছে—আনন্দ। এই ছড়িয়ে দেওয়া, এই প্রকাশ হওয়াতে মানুষের আনন্দ আছে তাই—আবার মানুষের আনন্দ আছে তাই এই ছড়িয়ে দেওয়াই, প্রকাশ হওয়া। এ'কে আশ্রয় করে মানুষ যে প্রতিদিন মনে করে যে সে তার প্রয়োজন সাধন করে' নিচ্ছে, সেটা তার পাটোয়ারী বুদ্ধির মাপকাঠি। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে, সমস্ত সৃষ্টির সম্বন্ধে যেটা খাঁটি নিছক সত্য সেটা হচ্ছে ঐ আনন্দের খেলা। এই আনন্দকে বুকে করে', এই আনন্দময় জগতে মানুষ ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠুরীতে চোখ বুঁজে চিরকাল বসে থাকতে পারে না। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস। সে যে চায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের মিলন। সে চায় হৃদয়ের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুলতে—বিশ্বের রঙে হৃদয়টা পূর্ণ করতে। আর এই হচ্ছে পঞ্চক—এই হচ্ছে মানুষ। আর এইটে হচ্ছে "অচলায়তনের" মূল কথা।

কিন্তু এই যে পঞ্চক—এই যে মানুষ—এই যে তার জীবন-দেবতার প্রেরণা—যে প্রেরণার বলে আবহমানকাল হ'তে বিশ্বমানবের অন্তরে

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তি স্বাদ

সত্য হ'য়ে ফুটে আছে—তা সার্থক করবার পক্ষে মস্ত বাধা পঞ্চককে ঘিরে আছে অচলায়তনের আকাশ-জোড়া প্রাচীর; আর তার মনের চারপাশে ঘিরে আছে পঞ্চাশ হাজার বছরের রাশীকৃত পুঁথি আর তার

সংখ্যাহীন শ্লোক। পঞ্চকের ঘরের চারপাশে যে প্রাচীর তা যত বড়-বড় পাথর দিয়েই গড়া হোক্ না কেন—যত উঁচু করেই গাঁথা হোক্ না কেন—তা ফুৎকারে কোথায় উড়ে যেত—বালার্কের স্পর্শে নীহার-স্তূপের মত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যেত যদি না থাক্‌ত তার মনের চারপাশে ঐ অসংখ্য পুঁথি আর তার সংখ্যাবিহীন শ্লোক। অন্তর-দেবতার যে সত্যিকার বন্ধন তা অচলায়তনের প্রাচীরে নেই—তা আছে, পুঁথির "কাকচঞ্চু পরীক্ষায়," "দ্বাবিংশ পিশাচভয়ভঞ্জনে।" এই অচলায়তনে বিধির চাইতে নিষেধ বেশী—কারণ এখানে সাহসের চাইতে ভয় বেশী। যেখানে প্রতি পদে বাধা মান্‌তে হবে—প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে' পা ফেল্‌তে হবে—সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে অমানুষ, দুনিয়া হ'য়ে ওঠে অসুখের জায়গা। সেখানে অচলায়তনের উঁচু প্রাচীর খাড়া করে' বাহিরটাকে চিরকাল বাহিরে রাখাই ভাল—সেখানে জীবনটাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থি লাগিয়ে কসে' বেঁধে রাখাই হয়ত সুবিধার কথা, কিন্তু মানুষের জীবন-দেবতার সার্থকতা সেখানে মিল্‌বে না কিছুতেই—পঞ্চকের সেখানে হাহাকার—মানুষের সেখানে জীবন্মৃত্যু।

পঞ্চকের সেখানে চির-হাহাকার। সে যে রাশীকৃত পুঁথির চাপে আপনার জীবন-দেবতাকে ঢাকতে পারেনি—পঞ্চাশ হাজার শ্লোকের কল কল কলরোলের মাঝে আপনার জীবন-দেবতার সত্যিকার কথাটী ডুবিয়ে দিতে পারে নি। তার জীবন-দেবতা যে নিশিদিন তার অন্তরে অন্তরে অভিমানের সুরে ডাক্‌ছে—"পঞ্চক" "পঞ্চক"। হায়! এ ডাক ত অচলায়তনের আর কেউ শোনে নি।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,

আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে.
কেউ ত টানে না।

না, এমন করে' আর কেউ টানে না পঞ্চককে—যেমন করে' টান্‌ছে তার অন্তরের জীবন-দেবতা—কেউ না—পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে' ছাপ্পান্ন হাজার পুরুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে যে পুঁথিগুলো, যে শ্লোকগুলো, যে ক্রিয়াগুলো, যে আচারগুলো—সে-গুলো ত নয়ই। জীবন-দেবতার ডাকে পঞ্চক পাগল—বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মতো তার আকুলতা—ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মতো তার ব্যাকুলতা—কোথায় পড়ে রইল তার "তট তট তোতয় তোতয়"—তার "ধ্বজাগ্রকেয়ূরী" "চক্রেশমন্ত্র"—সেই অচলায়তনে সেই আলোঢাকা বাতাস বন্ধকরা প্রাচীরের মাঝে পঞ্চকের গলা চিরে গান বেরিয়ে এল—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ যে অচলায়তনের বিরুদ্ধে মানুষের জাজ্বল্যমান বিদ্রোহের সূচনা! অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে এ ব্যাপার কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি, কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

কতশ যুগ কে জানে তার পেষণেও মানুষের জীবন-দেবতা মরল না! সে আজও অচলায়তনে জন্মে অচলায়তনে মানুষ হ'য়ে ছুটে বেরুতে চায়—আপনার আনন্দে—বিশ্বের মাঝে—খোলা আকাশের তলে! না, জীবন-দেবতা মরে নি—মরতে পারে না। ভগবান তেমন কাঁচা শিল্পী নন। পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে জীবন-দেবতার জয় হয়েছে। বাহিরেও তার জয় হবে নিশ্চয়। সেদিন বুঝি "অচলায়তনের" প্রাচীরের একটী পাথরও খাড়া হ'য়ে থাক্‌বে না।

(৩)

ঐ যে শোণপাংশুরা—যারা খেঁসারি ডালেরও চাষ করে আবার লোহাও পেটে, যারা নাপিত ক্ষৌর কর্‌তে কর্‌তে বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দিলে উল্টে নাপিতের গালে চড় কসিয়ে দেয়, আবার খেয়া নৌকয় উঠতেও তারা সেদিন কোনই ভয় করে না—অথচ এ সত্ত্বেও যারা একেবারে জাতকে-জাত অধঃপাতে যায় নি—সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে তাদের এমনি একটা সহজ স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ আছে যে, তাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একজটাদেবীও ভয় দেখাবার জন্যে বসে' থাকে না কিম্বা কারও গায়ের উপর হাঁই তুললেও তাদের আয়ু কমে যায় না। তারা হয়ত বাড়ীর উত্তর দিকটায় দিব্যি চাষ করে, সেখানে খেঁসারি ডালের বীজ বুনে দেয়—একজটাদেবীর একগাছি চুলও সেখান থেকে বেরয় না—বেরয় যা সেটা চমৎকার তাজা সোনারবরণ খেঁসারি ডাল অথচ এদের বজ্রবিদারণ-মন্ত্রও নেই, দ্বাবিংশপিশাচভয়-ভঞ্জনও নেই—হাজার প্রকার ভয় তাড়ানোর কোন মন্ত্রই নেই—বুঝি

এদের কোন ভয়ই নেই। অথচ—কিম্বা বুঝি সেই জন্যেই—এই শোণপাংশুদের এমন একটা শ্রী আছে, এমন একটা উল্লাস আছে যে অচলায়তনের বালকদেরও তা নাই।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা—এরা বেড়ে উঠেছে আপনারই আনন্দের ভিতর দিয়ে। এদের দৈনন্দিন কর্ম্মগুলো এদের এমন একটা সার্থকতা পাইয়ে দিয়েছে—এমন একটা রস পাইয়ে দিয়েছে যে সেই রসের আনন্দে তাদের প্রাণ ভরপুর; আর সেই প্রাণের আনন্দ, তাদের চোখে মুখে ললাটে আপনার ছায়া ফেলে তাদের করে তুলেছে শ্রীমান্, আনন্দমূর্ত্তি। কিন্তু ঐ যে "অচলায়তন" যেখানে দশ হাজার শ্লোকে মিলে বিশ হাজার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিচ্ছে—সেখানকার যে মানুষগুলো—তারা চল্‌ছে না, বসে রয়েছে—জীবন-দেবতার আনন্দে নয়। কারণ এরা যা কিছু করে, যা কিছু শেখে তার সঙ্গে এদের প্রাণের যোগ কোনখানেই নেই—এমন কি বুদ্ধির যোগও নেই। কারণ তাদের যে-সব মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ তার সম্বন্ধে কারও কোন প্রশ্ন করবারও অধিকার নেই। "হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই।" এ সবের সঙ্গে এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে অভ্যাসের যোগ—আর এই অভ্যাস সম্ভব হয়েছে অতীতের শাসনে। আর সেইজন্যে এদের মধ্যেকার যে "মানুষটা" সেটা বয়ে চলেছে একটা বিরাট ব্যর্থতা। কারণ মানুষের সম্বন্ধে সবার চাইতে সত্য যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ কল নয়। কিন্তু এমনি অভ্যাসের বল যে, এরা যে একটা বিরাট ব্যর্থতাকে বহন করে চলেছে সে কথাটাও এরা জান্‌ছে না—কেবল যে জান্‌ছে না তাই নয়, উল্টে আবার মনে করছে যে এইই অমৃত এইই মুক্তি এইই

আনন্দ। কিন্তু তবুও এদের মধ্যেকার "মানুষ" একেবারে মরে নি। এখনও একটু একটু তার স্পন্দন আছে। তাই যেদিন দাদাঠাকুরের দল এসে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এল, সেদিন তাদেরও প্রাণটা নেচে উঠলো—সেদিন যখন বালকেরা শুন্‌লে যে ষড়াসন বন্ধ, পংক্তি-ধৌতির দরকার নেই তখন তারা দুঃখিত হল না মোটেই—সেদিন তাদের "কি মজা রে কি মজা।" পঞ্চকের দু' ধারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে শোণপাংশুরা, আর একদিকে "অচলায়তন"—একদিকে তার প্রাণের ডাক গানের ডাক, আর একদিকে তার অতীতের আদেশের, অতীতের শাসনের ডাক—একদিকে খোলা আকাশের ডাক, আর একদিকে বন্ধ পুঁথির ডাক—একদিকে জীবনের আনন্দের ডাক, আর একদিকে মরণের শান্তির ডাক। পঞ্চককে কে জিতে নেবে? মানুষ কোথায় আপনার অমৃত খুঁজে পাবে? পঞ্চক তার মুক্তি অচলায়তনের বন্ধ পুঁথির শ্লোকের মাঝে খুঁজে পেলে না, খুঁজে পেলো তা খোলা বাতাসের সুরের মাঝে—মানুষ বুঝেছিল তার অমৃত, আঁধার-ঢাকা অচলায়তনের মধ্যে নেই, তা আছে আলোকমাখা আকাশের তলে।

এইটেই হচ্ছে আসল কথা। মানুষের মুক্তি, মানুষের অমৃত—তা আছে কোথায়? তার ধরে' রাখার মধ্যে নয়, তার ছাড়া-পাওয়ার মধ্যে। মানুষের হাত পা বোঝা হয়ে ওঠে তখন, যখন এদের বসিয়ে রাখা যায়—নইলে এরা মানুষের আনন্দেরই কারণ। আসল কথা হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে একটা ভগবানের বিধি আছে—তার হাত পা চোখ কান মন প্রত্যেকের, ভগবান-দত্ত একটা ধর্ম্ম আছে। মানুষের মঙ্গল ও আনন্দ আছে সেই সেই বিধি মানার মধ্যে, হাত পা চোখ

কান মনের সেই সেই ধর্ম্ম-উদযাপনের মধ্যে। মানুষের অমৃত এদের মেরে ফেলবার মধ্যে নেই—আছে এদের জাবন্ত করে' তোলবার মধ্যে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি—মানুষের জীবন-দেবতার ধর্ম্ম—তার সত্য কথা।

ঐ যে অচলায়তনের দল আর শোণপাংশুর দল এদের মধ্যে ঐ শোণপাংশুর দলই জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা মেনে চলেছে—তাই তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা পূর্ণ সার্থকতা রয়েছে—একটা জমাট আনন্দ রয়েছে—আর তাই এ জগৎটা তাদের কাছে মিথ্যা হয়ে ওঠে নি, মায়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তবুও এই শোণপাংশুদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা, একটা প্রকাণ্ড অভাব রয়ে গেছে—যেটা পঞ্চকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চল্‌ছে বটে কিন্তু জান্‌ছে না যে এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চল্‌ছে। আর তাই "এরা বাইরে থাকে বটে কিন্তু বাহিরটাকে দেখতেই পায় না।" কারণ এরা আপনার ভিতরটাকে মানে নি। দাদাঠাকুরের সঙ্গে এদের চোখের পরিচয় আছে বটে—কিন্তু তাকে এরা মন দিয়ে জানে না, প্রাণ দিয়ে চেনে না। দাদাঠাকুরকে এরা দাদাঠাকুর বলেই জানে গুরু বলে চেনে না। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে—চাই কি, একদিন এরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দাদাঠাকুরের অপমানই করে বস্‌বে।

মানুষের সকল অমঙ্গলের সূচনা হয় তখন যখন সে জীবন-দেবতাকে তার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করে তার মনের সিংহাসনে অহং-দেবতার আসন পাতে। মানুষের জীবন মিথ্যা দিয়ে ভরে ওঠবার সুযোগ পায় তখনই। এ মিথ্যা আপনাকে বিস্তার করতে পারে দু'দিকে। এক

নীচুদিকে আর এক উঁচুদিকে—এক মানুষকে অস্বীকার করার দিকে, আর এক মানুষকে অতিমাত্র স্বীকার করার দিকে—এক "অচলায়-তনের" দিক, আর এক মানুষের শক্তির দানবী-লীলার দিক।

কারণ ঐ যে "অচলায়তন"—তার প্রত্যেক পাথরটী খাড়া হ'য়ে উঠেছে মানুষের বিরাট অহঙ্কারের উপর—হাজার বালকের চোখের জল দিয়ে এর চূন শুর্‌কি গোলা হয়েছে—সুভদ্র যে উত্তরদিকের জানালা খুলতে চেয়েছিল বলে' তাকে ছয়মাস অন্ধকার কুঠুরীতে পুরে রাখবার মন্ত্রণা হয়েছিল—অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল যে পিপাসায় জল জল করে' প্রাণত্যাগ কর্‌লে, তবুও তার মুখে কেউ একবিন্দু জল দিলে না—এ সবের পিছনে যে একটা মস্ত বড় সত্ত্বগুণের খেলা চল্‌ছে তা মনে কর্‌বার কোন কারণ নেই—এসব হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের তামসিক লীলা—আর এর অন্যদিকটা হচ্ছে মানুষের অহঙ্কা-রের রাজসিক লীলা—যে লীলার—কতকটা উপশমের নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলে', বোধ হয় আরব্ধ হয়েছে বর্ত্তমান ইয়োরোপের মহাসমর।

এইখানেই মানুষের বিপদ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে চাই, জীবন-দেবতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন। দাদা-ঠাকুরকে দাদা-ঠাকুর বলেও জান্‌তে হবে আবার গুরু বলেও মান্‌তে হবে। "দাদাঠাকুরের মুখের কথাকে মনের ইচ্ছা করে তুল্‌তে হবে।" আর এ কর্‌তে হলে সারাদিন শোণপাংশুদের খালি পাক খেয়ে বেড়ালে চল্‌বে না। তাদের একটু বস্‌তে শিখ্‌তে হবে। আর এর জন্য দরকার মহাপঞ্চক। "কি করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয়" তার মন্ত্র—"ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য" আছে ঐ মহাপঞ্চকের হাতে। সেই

জন্য মহাপঞ্চকেরও দরকার একটা বড় রকমের দরকার—ঐ "অচলায়তন" ভেঙ্গে সেখানে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করান হবে যে নূতন শুভ্র সৌধ, সেই নূতন সৌধের মাঝে। এই মহাপঞ্চক যেদিন শোণপাংশুর অন্তরে গিয়ে বস্‌বে—শোণপাংশু যেদিন মহাপঞ্চকের দেহে গিয়ে লাগবে—যেদিন মহাপঞ্চকের আত্মজয়ের উপরে স্থাপিত হবে শোণপাংশুর কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা, যেদিন শোণপাংশুর প্রবৃত্তি মহাপঞ্চকের সংযম দিয়ে নিয়মিত হবে—সেদিন মানুষ হবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—দেবতার চাইতেও মহীয়ান্—দেবতার চাইতেও গরীয়ান—ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শিক্ষা-সমস্যা।

আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যে গোলমালটা হচ্ছে তার মধ্যে ছাত্র-সমাজের কেউ কোন কথা বলেছেন কিনা জানি নে—যদি বা বলে থাকেন তবে এই গোলযোগে সেটা যে কারও কানে পৌঁছয় নি তা সুনিশ্চয়। ছাত্র-সমাজের মুখপাত্র হয়ে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই, ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতার দাবীতে কয়েকটা কথা বলতে চাই, গোলযোগ বাড়াবার তরে নয়, যাদের শিক্ষার কথা নিয়ে তর্ক উঠেছে তাদের কোন দিক থেকে বিচার করতে হবে সেটা দেখান আমার কাজ। আমরা যে হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে প্রত্যহ হাঁটাহাঁটি করছি তার ফলে পেয়েছি কি? অর্থাৎ আমরা দেখতে চাই আমরা কি শিখছি তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কতদূর এগিয়েছে বা পিছিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক এগিয়েছে, University calender খুলে ডিগ্রীধারীর সংখ্যা নিরূপণ করে একথা বলতে অনেকে ছুটে আসবেন জানি, কিন্তু অন্য দেশে যাই হোক এখানে অমন ধারা অঙ্ক কষে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। যদি কিছু পাই সেটা ফাজিল ভিন্ন আর কিছু নয় বলেই মনে হয়, কাজেই সেটাকে বাদ দেওয়াই উচিত। তার কারণটা পরে বলছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বা আশুতোষ সব দেশে দু একটী করে এসে থাকেন কাজেই তাঁদের দোহাই দিলে আমরা শুনবো না,

আমাদের দেখতে হবে সাধারণ ছাত্রের অবস্থা। তারা যে আদর্শ যে ব্যবস্থা যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠছে সেই আদর্শ, ব্যবস্থা ও আবহাওয়া শিক্ষার পক্ষে যথেষ্টরূপে উপযোগী কিনা তাই আমাদের বিচার্য্য। অন্য দেশের বিধিব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে কাজ নেই কারণ এখানে তুলনা করা দুঃসাহস ভিন্ন আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার কথার উত্তরে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা মারা ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি দেখিয়ে বলবেন যে আগে আমাদের দেশে এ সব ছিল না; এ কথা মানি কিন্তু এ সব হয়ে যে বিশেষ উপকার হয়েছে তার লক্ষণ ত বড় বেশী দেখতে পাই নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা না পেলে মানুষ হিসেবে এঁরা যেমন থাকতেন এখনও তেমনি আছেন, অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শিক্ষার আদর্শ যাই হোক না, এখানে সেটা যে অচল তা আমরা সবাই জানি, অবশ্য জ্ঞানলাভ করবার জন্যে জ্ঞানের চর্চ্চা করে সব দেশেই এমন লোক কম কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপার্জ্জিত জ্ঞান কাজে খাটাবার মত শিক্ষা সকলেই পায়। জ্ঞান জিনিসটা মনের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়, যা মেশে না তা জ্ঞান নয়—কিন্তু আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যে জ্ঞান নয় তার প্রমাণ, আমাদের প্রাণের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই, যদি থাকত তবে কোননা কোন আকারে তার প্রকাশ হত। আমাদের এই বিদ্যাটা নিতান্ত অবিদ্যার মত ঘাড়ের উপর বসে রক্ত মাংস খাচ্ছে শুধু তাই নয় প্রাণ পর্য্যন্ত শুষছে। তাই আমরা যত শীঘ্র পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ী পার হয়েই এই যুগ সঞ্চিত বিদ্যার বোঝা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরি এবং বাপ দাদা যেমন করে জীবন কাটিয়ে ছিলেন সেই ধারা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কোন রকমে আর খাপ খাওয়াতে পারি না—আমাদের সেই আলস্যময় জীবনের উপর আমাদের অর্জ্জিত বিদ্যা যেন দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে। আমাদের দ্বারা আর কিছু হবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের ছাত্রজীবনের চারিদিকে শিক্ষার কোন আবহাওয়া নেই বল্লে অত্যুক্তি হবে না। এই একটা সময় যখন জীবনে যা কিছু বড়, যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর তাকে আমরা সারা প্রাণ দিয়ে পূজা করতে পারি—এই সময়ে আমরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করি বিজ্ঞেরা যা শুনলে অবজ্ঞার হাসি হাসবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের এই আরাধনার আবহাওয়ার মধ্যে আমরা থাকতে পাই নে। দোষটা যে আমাদের নয় তার কারণ আবহাওয়াটা তৈরী আমরা করি নে—যথার্থ শিক্ষার চারদিকে সেটা আপনি গড়ে উঠে এবং ছাত্র-জীবনের খোলা দরজার মধ্যে সেটা আপনি ঢুকে পড়ে মানুষ গড়বার যথেষ্ট উপাদান এনে দেয়।

আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষক এই দুটি-পথ আটকে বসে আছেন। শিক্ষার আদর্শকে তারা এমন খর্ব্ব করেছেন, শিক্ষার আবহাওয়াটা তাঁরা এমনি ঘুলিয়ে রেখেছেন, যে সেখানে থাকলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি, কাজেই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা কিসে দম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি কারণ পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার সম্বন্ধে চাচার অনেক উপদেশ আমরা প্রত্যহই পাই।

(২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণাগুণ বিচার হয় পরীক্ষার সাহায্যে। শিক্ষিতজনের পক্ষে পরীক্ষা নাকি কষ্টিপাথরের মত কাজ করে। কষ্টিপাথরের মর্য্যাদা তার দ্বারা যে ধাতুর পরীক্ষা হয় সেই ধাতুর উপরে

নির্ভর করে তার নিজের দাম নিয়ে কেউ বড় মাথা ঘামায় না—এখানে কিন্তু তার উল্টোটাই হয়েছে—শিক্ষা যত হোক আর না হোক পরীক্ষার উপর সকলেরি ঝোঁক, কাজেই তার দাম অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। কোন রকমে তার উপর আঁচড় ফেলতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। শিক্ষার চেয়ে পরীক্ষার দাবী গুরুতর হয়ে ওঠায়, শিক্ষা ছেড়ে আমরা পরীক্ষাকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছি, কোন রকমে চোখ কাণ বুজে বৈতরণীটা পার হয়ে যাই, তারপর কি তা জানি না। আমি পরীক্ষার উপর কটাক্ষপাত করছি না যাতে পরীক্ষার অর্থটা পরিষ্কার হয়ে উঠে তার চেষ্টা করছি।

পরীক্ষাভীতিটা আমাদের মধ্যে যে সংক্রামক হয়ে উঠেছে তার কারণ পরীক্ষার উদ্দেশ্য আর পরীক্ষকের কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিটীর উদ্দেশ্য এক নয়। অনেকে হয়ত University regulations খুলবেন আমার কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে, যেমন নারী-সমস্যা নিয়ে কথা উঠলে তাঁরা মনু খুলে বসেন। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবিক তা নয়। মনুতে যা লেখা আছে তা মানলে বোধ হয় কোন তর্ক উঠত না—University regulations-এ যা লেখা আছে তা মেনে চললে হয়ত পরীক্ষাটা অত ভয়ের কারণ হয়ে উঠত না। শিক্ষার আদর্শ এইখানেই খর্ব্ব হয়েছে—শিক্ষকদের ও অভিভাবকদের কাছে আমরা যেমন শুনি তাতে পরীক্ষাকে একটা সঙ্কট মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেমন করে আদর্শ খর্ব্ব হয়েছে তা নিয়ে বিচার করবার মত বিদ্যা বা সময় আমার নেই, তবে বর্ত্তমানের এই খর্ব্বতার মূলে আমরা যাঁদের দেখতে পাই তাঁদের সম্বন্ধে দু একটী কথা বলতে চাই, তাহলে আমাদের কথাটা পরিষ্কার হয়ে আসবে।

বাড়িতে অভিভাবক ও স্কুল কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ হয়েছেন যে আমাদের নিজের হাতে করবার মধ্যে কেবল নোট মুখস্থ ছাড়া আর কিছু নেই। এ বিষয়ে আমরা এক একটা কল বনে গেছি—আমাদের ভুলতে হয়েছে যে আমরা নিজেরা ভাবতে পারি, চিন্তাশক্তি কাজে খাটাতে পারি, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারি—আমাদের মনের এই স্বাভাবিক গতিটুকু এখন মাষ্টারের নোটের খাতার মধ্যেই বন্ধ। নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা সহজ জ্ঞানের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করার ফলে নিজের শক্তির উপর আস্থা বড় কম হয়ে যায়। আমাদের হয়েছেও তাই।

গতানুগতিক ভাবে জীবনটাকে কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়াকে যাঁরা চরম মনে করেন তাঁদের কাছে নতুন কিছু আশা করা অবশ্য নিরাশ হবার জন্যই। আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ও এর হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। তাঁরা যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত নন তা নয়, কিন্তু সে পদ্ধতি যে আমাদের দেশে খাটে ও তাতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যায় এমনতর চিন্তা তাঁরা করেন কিনা সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁরা যে নিয়মে শিখেছেন সেই নিয়মেই শেখাতে চান, পরিবর্ত্তনের কথাটাকে কোন রকমে আমল দিতে চান না—যদিও তাঁরা জানেন যে আগের ব্যবস্থা অভ্রান্ত নয় এবং আগে যা চলেছে এখন তা নাও চলতে পারে। মনের প্রসার, জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তা-শক্তির বৃদ্ধির দিকে তাঁদের নজর যতখানি পরীক্ষার সাফল্যের দিকে দৃষ্টি তার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁরা যে আমাদের মঙ্গল চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায় একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার

উদ্দেশ্য যদি চাকরীর সুপারিশ হয় তবে তাঁরা যে ঠিক কাজ করছেন এ কথা সবাই বলতে বাধ্য কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক ঐটি কিনা তা নিয়ে কিছু গোল আছে! যাই হোক তাঁরা যে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাজ করুন না কেন, তার ফলে আমাদের অবস্থা বড় বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপদেশের চেয়ে উদাহরণের জোর ঢের বেশী। নোট সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে খাটে। আমরা যে আদর্শ ধরে কাজ করি তাতে নোটই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। কেবলমাত্র syllabus বজায় রেখে আমরা চলি বলে আমাদের স্বাধীন চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমাদের অবকাশ থাকলেও নিজেদের আগ্রহ ও উপর-ওয়ালার উৎসাহ যথেষ্ট কম। স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ না পাওয়ায় আমরা মনে এক একটী কুঁড়ের বাদশা হয়ে দাঁড়িয়েছি। তার ফলে অবকাশ পেলেও পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া কোন রকম পরিশ্রমে অভ্যস্ত না থাকার দরুন আর কোন বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকে না। দোষটা আমাদের কিন্তু আমরা এর জন্যে মুখ্য ভাবে দোষী নই। মানুষের স্বভাবের মধ্যে অনুকরণটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে! নতুন পথ কেটে যাবার মত সাহস ও শক্তি সকলের নেই। কাজেই বাপ দাদার অনুকরণ করাটা আমরা নিজের পথ কেটে যাওয়ার চেয়ে সহজ মনে করি। তার ফল যে কি হচ্ছে সে দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য নেই, কারণ আমরা চিন্তার কোন ধার ধারি না সে কাজটা আমাদের শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত আছে।

আমাদের প্রধান সমস্যাটা এইখানেই। আমরা বলি শিক্ষক মশায় ঠিক পথটা দেখিয়ে দিন সারা পথ হাতধরে নিয়ে যাবার কোন দরকার

দেখি না। হয়ত আমরা পা ফেল্‌তে ভুল করতে পারি কিন্তু তা বলে নিজের শক্তিকে অবিশ্বাস করে শক্তিকে অকেজো করে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সত্য নেই। যে ব্যবস্থায় পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে সুফল পাওয়া যাচ্ছে শুধু আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম হবে এ কথার কোন মানে নেই এবং এ ব্যবস্থায় কোন কোন স্থানে সুফল ফলেছে তাও আমরা জানি।

আমাদের শিক্ষালাভের পথে আরও দশ রকমের বাধা আছে কিন্তু সে-সবের বিচার কয়েকবার হয়ে গেছে। শিক্ষকের লক্ষ্য, শিক্ষার আদর্শ নিয়ে যারা তর্ক করছেন তাঁরা তর্ক করুন কিন্তু যাঁরা আমাদের মঙ্গলের চেষ্টায় আছেন তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন পরীক্ষা-সঙ্কটের এই চোরা-বালি থেকে তাঁরা আমাদের উদ্ধার করুন। শিক্ষা যদি যথেষ্ট পাওয়া যায় তবে পরীক্ষা যেমনই হোক তাকে সঙ্কট মনে করবার কোন কারণই থাকবে না। অধিকন্তু আমরা কিছু না শেখবার জন্যে যদি দেহ মন প্রাণ সব জখম করতে পারি কিছু শেখবার জন্যে তার চেয়ে কিছু বেশী করতে পারব এ সুনিশ্চয়।

আমরা হোমরুলের আবেদন, কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ বা কন্যাপণ নিয়ে চাঁদার খাতা খুলছিনে, আমরা প্রার্থনা করছি যে বর্ত্তমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেন সার্থক হয়ে উঠে। যা'হক করে এটাকে খাড়া করে রাখার কোন ফল নেই, অন্যায় ক্ষতির পরিমাণ তাতে বাড়বে বই কমবে না। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চেষ্টা করুন যাতে প্রধান সমস্যাটার সমাধান হয়, অনুকরণের যুগে পশ্চিমের অনুকরণ ত অনেক করেছি এখন একটু বুঝে অনুসরণ করলে যথেষ্ট উপকার হবে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।